হরে কৃষ্ণ হরে কৃষ্ণ কৃষ্ণ কৃষ্ণ হরে হরে।
হরে রাম হরে রাম রাম রাম হরে হরে॥

পথের আলো

অগ্রহায়ণ * ১৪২১

একোনপঞ্চশৎ বর্ষ * অষ্টম সংখ্যা

বন্দে বন্দারুমন্দারং বৃন্দারকবিবন্দিতম্।
স্মেরাস্যং সুন্দরং সৌম্যং সীতারামং সনাতনম্॥
কৃষ্ণঃ করোতু কল্যাণং কংস-কুঞ্জর-কেশরী।
কালিন্দী-কলকল্লোল-কোলাহল-কুতূহলী॥

উপদেষ্টা মণ্ডলী

সংঘ আচার্য্য এবং সর্বাধীশ কিঙ্কর বিঠ্ঠল রামানুজ
সাহিত্যিক শ্রী সঞ্জীব চট্টোপাধ্যায়

যুগ্ম-সম্পাদক

অধ্যাপক শ্রীরামরঞ্জন ভট্টাচার্য এবং
কিঙ্কর সামানন্দ

সহ-সম্পাদক

শ্রী সমীরণ মুখোপাধ্যায়

সঞ্চালক, বার্তা বিভাগ

কিঙ্কর প্রণবানন্দ

সঞ্চালক, উপায়ন বিভাগ

শ্রী তারকনাথ চট্টোপাধ্যায়

সঞ্চালক, শ্রীকোষ বিভাগ

শ্রী দীপক দেবনাথ

কর্মাধ্যক্ষ

শ্রী অরবিন্দ বন্দ্যোপাধ্যায়

মহামিলন মঠ

৭/৭, পি.ডব্লিউ.ডি. রোড, কোলকাতা - ১০৮
দূরভাষ ঃ ২৫৭৭ ৫১৭৯/২৮৭৩ ২৪৩৮
website : www.patheralo.org

সূ চী প ত্র

বারো টাকা মাত্র

সম্পাদকীয় * ৩১৬

শ্রীশ্রীচণ্ডী *
শ্রীশ্রীঠাকুর ৩১৭

মন্নাথ জগন্নাথ *
কিঙ্করী যোগমায়া দেবী ৩১৯

লীলাচিন্তা *
বিমল কুমার মিশ্র ৩২১

যীশুখ্রীষ্ট, তৎঅনুরাগী ও শ্রীশ্রীঠাকুর *
কিঙ্কর শরণানন্দ ৩২৫

শতবর্ষব্যাপী অখণ্ড হরিনাম সংকীর্তন... *
চিত্তরঞ্জন পাঁজা ৩২৮

মহামিলন মঠে শ্রীশ্রীঠাকুরের লীলা প্রসঙ্গ *
হিমাংশু রায় ৩৩০

মর্তেষু অমৃতম্ *
(শ্রীশ্রীঠাকুরের সাধনলীলা)
মৃণালকান্তি ভট্টাচার্য্য ৩৩৩

অযাচিত কৃপালাভ *
শ্রী শম্ভু দেবনাথ ৩৩৭

অন্তরের অন্তঃস্থলে হে মহারাজ *
অপর্ণা ব্যানার্জী ৩৪০

ভুবনেশ্বর শ্যামাশঙ্কর মঠে...চাতুর্ম্মাস্য উৎসব *
শ্রী রতিকান্ত মিশ্র ৩৪৩

সংঘ সমাচার

টাটকাপুরে ওঙ্কারনাথ মিশনের স্বাস্থ্য...শিবির *
কিঙ্কর সমীরণ ৩৪৫

কবিতা

পরশ *
অনীশ দাস ৩৪৬

অর্ঘ্য *
অপূর্ব মুখোপাধ্যায় ৩৪৬

প্রতি সংখ্যা ঃ বারো টাকা মাত্র *** বার্ষিক সডাক মূল্য ঃ একশো পঞ্চাশ টাকা মাত্র

সম্পাদকীয়

শ্রীশ্রীঠাকুরের এবারের লীলায় একদিকে যেমন সকল দেবতার, তীর্থের, শাস্ত্রের পুনরুজ্জীবন প্রকাশিত হয়েছে; তেমনি গুরু, শিব-শক্তি এবং জগন্নাথদেবের বিশেষ মহিমাও কীর্ত্তিত হয়েছে। আমরা লক্ষ্য করি এবার তিনি সকল দেবতা, ইষ্টের প্রতি মানুষকে অগ্রসর করে তার পূর্ণতার চাবিকাঠি হাতে তুলে দিয়েছেন শ্রীগুরুপ্রপন্নতার পথে। স্বয়ং গুরুপাদুকা বক্ষে ধারণ করে বে-নজির নজির স্থাপন করলেন। সমগ্র লীলায় আচরণ করে শেখালেন শ্রীগুরুসেবা ও ভক্তি কাকে বলে। তাঁর লেখনী মুখে আবির্ভূত হলেন 'শ্রীগুরু মহিমামৃত' এবং 'গুরুপূজা' নামক দুটি মৌলিক গ্রন্থ। যা সকলের অবশ্যই পথ এবং প্রাপ্তি। এছাড়া আরও বহু স্থলে সেটা গ্রন্থ, প্রবন্ধ কিম্বা চিঠি যা-ই হোক্ সর্বত্রই 'গুরু'র কথা তিনি আমাদের জন্য বলেছেন।

জগদ্‌গুরু শ্রীশ্রীওঙ্কারনাথদেব যুগের প্রয়োজনে এবং 'যার পেটে যা সয়' সেদিকে বিশেষ করুণাবশতঃ ক্ষেত্রবিশেষে পথের বৈচিত্র্যের নিদর্শন লীলায় রেখেছেন। তবু নামসংকীর্তনকে যেমন সর্বসাধারণের জন্য বিশেষ শক্তিযুক্ত করে উপহার দিয়েছেন, তেমনি সদাচার, শুদ্ধাহার ও কালে উপাসনার কথাও বলেছেন। বলেছেন নাম, রূপ, লীলা ও ধামের অন্ততঃ একটিকে আশ্রয় করার কথা। স্মরণ করিয়ে দিয়েছেন গুরু ও শিব অভিন্ন। শিব আবার শক্তি সমন্বিত। শ্রীমৎ ভূমানন্দদেব বলতেন, 'কিছু না পারলে শ্রীঠাকুরকে ধরে পড়ে থাকো। তাঁর কাছে প্রার্থনা করো, তিনিই শক্তি দেবেন। তাঁর পথে চলার অনুকূল পরিস্থিতি ও যোগ্যতা তিনিই দেবেন।'

কিন্তু এ যুগে প্রার্থনার আগেই আসবে প্রশ্ন। সেই প্রশ্নের সৃষ্টি সংশয় থেকে, অশুদ্ধ চিত্তের প্রতিফলনে। শ্রীশ্রীঠাকুর তাই 'শিবনামামৃত লহরী' গ্রন্থে বলছেন, 'শিবভক্ত অধুনা বড়ই দুর্লভ।' ঠাকুরের কাছেই আমরা শুনেছি চিত্তশুদ্ধির জন্য চাই সদাচার। শাস্ত্রে যে দশ লক্ষণ ধর্মের কথা আছে, শ্রীঠাকুর তাকে এককথায় 'শৌচ' বলেছেন। সেই শৌচ বাহ্য ও অন্তরভেদে দু'রকম। তার মধ্যে বাহ্য ও অন্তর আহারের শুদ্ধি যদি কোন মতে রক্ষিত হয়, তবে আর চিন্তার কিছু থাকে না। আসলে 'রসনা' ইন্দ্রিয়টির অনেক শক্তি। তাকে জয় করার জন্যই ঠাকুর নাম করতে বলেছেন। নামামৃতের দ্বারাই রসনা দগ্ধ হয়ে যায়। প্রশ্ন হয় দগ্ধ করা তো অগ্নির ধর্ম। অমৃতে দগ্ধ হবে কি করে? শ্রীশ্রীঠাকুরের কাছে উত্তর পেলাম, 'মিথ্যা কথা, বৃথা কথা, যথেচ্ছ ভোজনের দ্বারা জিহ্বা কলুষিত হয়ে যায় সে বাইরের রসের লোভে প্রতিনিয়ত লাঞ্ছিত হতে থাকে। সুখ তো বাইরে নাই—সুখের স্থান হল অন্তরতম প্রদেশে। সেখানে প্রবেশ করতে হলে ইন্দ্রিয় জয় করতে হয়। দশটি ইন্দ্রিয়ের মধ্যে রসনা আর উপস্থ বড় ভীষণ...তার মধ্যে রসনাই সর্বশ্রেষ্ঠা। শিবনাম অমৃতের দ্বারা রসনার পাপ দগ্ধ হয়ে যায়। একথা বলবার উদ্দেশ্য—তার চিহ্নমাত্র থাকে না। সাত্ত্বিক ভোজনের দ্বারা দেহ রক্ষা করে, তার দ্বারা প্রাণ স্থির হয়, মন স্থির হয়। মা আমার বৈখরী থেকে মধ্যমায় গিয়ে রাগরাগিণী, আলাপ করতে থাকেন।''

আমরা যদি এই আনন্দে আগ্রহী না-ও হই, জাগতিক সুখও যে রসনা জয়কারী, নামকারীর কাছে সহজে আসবে সে কথাও ঠাকুর 'শিবমহিমামৃতে' জানিয়েছেন, 'শিবনামজাপীর চরণে না চাইলেও ভোগসকল এসে লুটিয়ে পড়ে, তিনি সে সব উপেক্ষা করে ভূমানন্দে মগ্ন হয়ে যান।'

শ্রীশ্রীচণ্ডী

প্রণব-প্রেমামৃত ভাষ্য

শ্রীশ্রীঠাকুর

[শ্রীশ্রীঠাকুর রচিত চণ্ডী থেকে শ্রীশ্রীপ্রণব প্রেমামৃত ভাষ্যের শ্রীহস্ত লিখিত পাণ্ডুলিপিটি চতুর্থ অধ্যায় থেকে আমাদের হস্তগত হয়েছে। তাই এখান থেকেই পাঠকের কাছে গ্রন্থটি নিবেদন করা হল। চণ্ডীর এক থেকে তৃতীয় অধ্যায় পর্যন্ত শ্রীশ্রীঠাকুর লিখিত ও শ্রীগুরু প্রকাশন কর্তৃক প্রকাশিত পূর্ণাঙ্গ গ্রন্থ অনেকদিন পূর্বেই প্রকাশিত হয়েছে। মহামিলন মঠে পাওয়া যাচ্ছে। —সম্পাদক]

(পূর্বানুবৃত্তি)

অষ্টম অধ্যায়, রক্তবীজবধ

প্রশ্ন ঃ 'প্রাহ সত্বরা' ইহার অন্যরূপ ব্যাখ্যা হয়?

উত্তর ঃ হ্যাঁ (তত্ত্বপ্রকাশিকা বলিয়াছেন) প্রহন্যতে♦ত্র ইতি প্রাহোরণঃ, অন্যতো♦পি দৃশ্যতে ইতি ডঃ, তত্র সত্বরা ত্বরাবতী। তথা চ স্কান্দে—''রথেন কাঞ্চনাঙ্গেন প্রযযৌ প্রাহলালস'' ইতি। প্রাহ লালসো রণাভিলাষী। যদ্বা তান্ অসুরান্ দৃষ্ট্বা চণ্ডিকা প্রাহসৎ, অহো ময়ি রণ শিরসি স্থিতায়ামপ্যেতে যৎ বিভ্যতি তন্মমাপি বলানভিজ্ঞঅ ভীরব এবেতি মত্বা ইতি ভাবঃ। কীদৃশী? ত্বরা ত্বরাবতী অর্শ-আদ্যৎ, অজাদি হলন্ত ইত্যাদিনা দ্বিতকারবান্ পক্ষে ত্বরা শব্দঃ...ইত্যাদি।

মচ্ছস্ত্রপাতসম্ভূতান্ রক্তবিন্দুন্ মহাসুরান্।
রক্তবিন্দোঃ প্রতীচ্ছ ত্বং বক্ত্রেণানেন বেগিতা ॥ ৫৪

অন্বয় ঃ মচ্ছস্ত্রপাতসম্ভূতান্ রক্তবিন্দুন্ রক্তবিন্দোঃ (সম্ভূতান্) মহাসুরান্ বেগিতা অনেন বক্ত্রেন ত্বং প্রতীচ্ছ॥ ৫৪

বঙ্গানুবাদ ঃ আমার শস্ত্রপাত উৎপন্ন রক্তবিন্দু সকলকে ও রক্তবিন্দুজাত মহাসুরগণকে সত্বর বিস্তৃত মুখের দ্বারা গ্রহণ কর॥ ৫৪

প্রণব-প্রেমামৃত ঃ মচ্ছস্ত্রপাতসম্ভূতান্ মমাস্ত্রপাতজাতান্ রক্তবিন্দূন্ শোণিতবিন্দূন্ রক্তবিন্দোঃ রক্তবিন্দুভ্যঃ ''রক্তবিন্দোরিতি জাতাবেকত্বং'' (তত্ত্বপ্রকাশিকা)।

''জাত্যপেক্ষয়া''—নাগোজী।

''ততো জাতান্ মহাসুরান্ মচ্ছস্ত্রপাতসম্ভূতান্ রক্তবিন্দুশ্চ ভূমিমপ্রাপ্তানেব প্রতীচ্ছ—গৃহাণ।'' (তত্ত্বপ্রকাশিকা)। ''যদ্বা রক্তেন বিন্দতি শরীরান্তরং লভতে রক্তবিন্দুরসুরঃ। তস্য রক্তবিন্দুন্মহাসুরানিতি কার্য্যকারণয়োরভেদ বিবক্ষয়া।'' মহাসুরান্ বেগিতা অনেন বিস্তীর্ণেন বক্ত্রেন আস্যেন প্রতীচ্ছ ভক্ষয়।।

ভক্ষয়ন্তী চর রণে তদুৎপন্নান্ মহাসুরান্।
এবমেষ ক্ষয়ং দৈত্যঃ ক্ষীণরক্তো গমিষ্যতি॥ ৫৫

অন্বয় ঃ তদুৎপন্নান্ মহাসুরান্ ভক্ষয়ন্তী রণে চর এবং এষঃ দৈত্যঃ ক্ষীণরক্তঃ সন্ ক্ষয়ং গমিষ্যতি॥ ৫৫

বঙ্গানুবাদ ঃ রক্তবিন্দুসম্ভূত মহাসুরগণকে ভক্ষণ করত যুদ্ধে বিচরণ কর, এইরূপ করিলে এই রক্তবীজ ক্ষীণরক্ত হইয়া বিনষ্ট হইবে॥ ৫৫

প্রণব-প্রেমামৃত ঃ তদুৎপন্নান্ রক্তবিন্দুজাতান্ মহাসুরান্ মহাদৈত্যান্ ভক্ষয়ন্তী রণে যুদ্ধে চর বিচর এবং অনেন প্রকারেণ এষঃ দৈত্যঃ রক্তবীজঃ ক্ষীণরক্তঃ রক্তশূন্যঃ (সন্) ক্ষয়ং নাশং গমিষ্যতি প্রাপ্স্যতি।।

ভক্ষ্যমাণাস্ত্বয়া চোগ্রা ন চোৎপৎস্যন্তি চাপরে॥ ৫৬

অন্বয় ঃ ত্বয়া ভক্ষ্যমাণাঃ অপরে উগ্রাঃ ন চ উৎপৎস্যন্তি॥ ৫৬

বঙ্গানুবাদ ঃ তুমি ভক্ষণ করিতে থাকিলে আর উগ্র অসুরগণ উৎপন্ন হইবে না॥ ৫৬

প্রণব-প্রেমামৃত ঃ ত্বয়া ভক্ষ্যমাণা চ ত্বর্থ অপরে অন্যে উগ্রাঃ ভীষণাঃ চ এবার্থ ন চ সমুচ্চয়ার্থ উৎপৎস্যন্তি উৎপন্না ভবিষ্যন্তি।

ইত্যুক্ত্বা তাং ততো দেবী শূলেনাভিজঘান তম্।
মুখেন কালী জগৃহে রক্তবীজস্য শোণিতম্॥ ৫৭

অন্বয় ঃ দেবী তাং ইত্যুক্ত্বা তং শূলেন অভিজঘান ততঃ কালী মুখেন রক্তবীজস্য শোণিতং জগৃহে॥ ৫৭

বঙ্গানুবাদ ঃ দেবী তাঁহাকে ইহা বলিয়া রক্তবীজকে শূলের দ্বারা আঘাত করিলেন। অনন্তর কালী মুখের দ্বারা রক্তবীজের শোণিত পান করিতে লাগিলেন॥ ৫৭

প্রণব-প্রেমামৃত ঃ দেবী কৌশিকী তাং কালীং ইত্যুক্ত্বা ইতি কথয়িত্বা তং রক্তবীজং শূলেন অভিজঘান। ততঃ অনন্তরং কালী চামুণ্ডা মুখেন আস্যেন রক্তবীজস্য শোণিতং রক্তং জগৃহে পীতবতী॥

ততো♦সাবাজঘানাথ গদয়া তত্র চণ্ডিকাম্।
ন চাস্যা বেদনাঞ্চক্রে গদাপাতো♦ল্পিকামপি॥ ৫৮

অন্বয় ঃ ততঃ অসৌ অথ তত্র গদয়া চণ্ডিকাং আজঘান, গদাপাতঃ অস্যাঃ অল্পিকাং অপি বেদনাং ন চ চক্রে॥ ৫৮

বঙ্গানুবাদ ঃ অনন্তর রক্তবীজও যুদ্ধে গদার দ্বারা চণ্ডিকাকে আঘাত করিল গদাপ্রহর চণ্ডিকার কিছুমাত্র বেদনা জন্মায় নাই॥ ৫৮

প্রণব-প্রেমামৃত ঃ ততঃ অনন্তরং অসৌ রক্তবীজঃ অথ অপি তত্র যুদ্ধে গদয়া চণ্ডিকাং আজঘান তাড়িতবান্ গদাপাতঃ গদাপ্রহারঃ অস্যাঃ চণ্ডিকায়াঃ অল্পিকামপি অল্পমপি বেদনাং ব্যথাং ন চক্রে নৈব চকার।

তস্যাহতস্য দেহাত্তু বহু সুস্রাব শোণিতম্।
যতস্ততস্তদ্ বক্ত্রেণ চামুণ্ডা সম্প্রতীচ্ছতি॥ ৫৯

অন্বয় ঃ আহতস্য তস্য যতঃ দেহাৎ বহু শোণিতং সুস্রাব ততঃ তদ্ বক্ত্রেণ চণ্ডিকা সংপ্রতীচ্ছতি॥ ৫৯

বঙ্গানুবাদ ঃ তাড়িত রক্তবীজের যে দেহ প্রদেশ হতিে বহু শোণিত নির্গত হইতে লাগিল, সেই স্থান হইতেই মুখের দ্বারা চণ্ডিকা পান করিতে লাগিলেন॥ ৫৯

প্রণব-প্রেমামৃত ঃ আহতস্য তাড়িতস্য তস্য রক্তবীজস্য যতঃ যস্মাৎ দেহাৎ দেহপ্রদেশাৎ বহু শোণিতং অধিক রুধিরং সুস্রাব অস্রবৎ ততঃ তস্মাদ্দেহপ্রদেশাৎ তদ্ শোণিতং বক্ত্রেণ মুখেন চামুণ্ডা সংপ্রতীচ্ছতি সম্যক্ পিবতি স্ম।।

মুখে সমুদ্গতা যেহস্যা রক্তপাতান্ মহাসুরাঃ।
তাংশ্চখাদাথ চামুণ্ডা পপৌ তস্য চ শোণিতম্।॥ ৬০

অন্বয় ঃ অস্যাঃ মুখে রক্তপাতাৎ যে মহাসুরাঃ সমুদ্গতা চামুণ্ডা তান্ চখাদ, অথ তস্য শোণিতং চ পপৌ॥ ৬০

বঙ্গানুবাদ ঃ কালীর মুখে রক্তপাত হইতে যে সমস মহাসুর সমুৎপন্ন হইয়াছিল, চামুণ্ডা তাহাদিগকে ভক্ষণ করিলেন এবং রক্তবীজেরও শোণিত পান করিতে লাগিলেন॥ ৬০

প্রণব-প্রেমামৃত ঃ অস্যাঃ কাল্যাঃ মুখে বদনে রক্তপাতাৎ শোণিতপতনাৎ যে মহাসুরাঃ মহাদৈত্যাঃ সমুদ্গতাঃ সমুৎপন্নাঃ চামুণ্ডা কালী তান অসুরান্ চখাদ অখাদৎ অথ অনন্তরং তস্য রক্তবীজস্য শোণিতং রুধিরং চ অপি পপৌ পীতবতী।

প্রশ্ন ঃ ভূমিতে রক্তপাত হইলে তো অসুর জন্মিবে। মুখে কি প্রকারে হইতেছে?

উত্তর ঃ (তত্ত্বপ্রকাশিকা) যদিও ক্ষিতিতে রক্তপাত হইলে অসুর উৎপত্তির কথা বলা হইয়াছে, মুখে রক্তপাত হইতে অসুরোৎপত্তির সম্ভব (সম্ভাবনা) নাই—তথাপি মূলপ্রকৃতির অংশভূতা তাঁহাতে সকল কার্য্য সূক্ষ্মরূপে অবস্থানহেতু পৃথিবীতে রক্তপাত অবিরুদ্ধ। মুখের পার্থিবত্বহেতু।

ক্রমশঃ

গুরুদেবের কৃপা ধন্যা

শ্রীমতী মিঠু চট্টোপাধ্যায়

খ্যাতনামা কীর্ত্তনীয়া

ঃ যোগাযোগ ঃ
উপেন ব্যানার্জী লেন, সাতঘাট
গোন্দলপাড়া, চন্দননগর, হুগলি
পিন- ৭১২১৩৭

ঃ দূরভাষ ঃ
(০৩৩) ২৬৮৩-২৯৪৭
৯৮৩১৫৮৪৭৯৩

মন্নাথ শ্রীজগন্নাথ

কি ঙ্ক রী যো গ মা য়া দে বী

অবতাররূপে ভগবান বারবার এসেছেন মানুষকে উদ্ধার করতে। এবার শ্রীশ্রীঠাকুর নারীদের উদ্ধার করার জন্য তাদেরকে জাগাবার জন্যই এসেছিলেন। ১৩৬৭ সালে সতীসংঘ স্থাপন করার আগে তারিঘাটে ঠাকুর মৌন অবস্থায় ভাঙা একটি সরকাঠির ঘরে সন্ধ্যায় চিঠি লিখলেন 'পতিধর্ম মহাব্রত, এ জগতে অস্তমিত, হোক পুনরোদিত, মা তোদের কৃপা করুক।' এই চিঠিটি লিখলেন আর তার সাথে একটি গান লিখলেন 'জাগো মা জননী, জাগো মা আবার', সবকিছুই ঠাকুর তখন মৌন অবস্থায় চিঠির মাধ্যমে করছিলেন আর সেবিকা তার পাশে বসে চিঠির উত্তর দিচ্ছিল। তিনি বলেন 'সতীনাং পদরজ সদ্যপূত বসুন্ধরা' অর্থাৎ সতীদের পদধূলায় বসুন্ধরা শুদ্ধ হয়। এরপরে ধ্যানে ভেসে ওঠার পরই ১৩৬৭ সনে সতীসংঘ স্থাপন হল। ঠাকুর বললেন সতী মানে শুধু কামকে জয় করা নয়; আমাদের শরীরে যত রিপু আছে অর্থাৎ কাম-ক্রোধ-লোভ-মোহ-মদ মাৎসর্য সমস্ত রিপুকেই জয় করতে হবে। সেবিকা তাই আজও সতীসংঘে মায়েরা এলে জিজ্ঞাসা করে দেখে যে মায়েরা দীক্ষা নিয়ে ঠাকুরের সান্নিধ্যে থেকে কতখানি পরিবর্তিত হতে পেরেছে। কারণ মায়েদের সংসারের অনেক কাজ সামলে, অনেক কষ্ট করে জগন্নাথ নিবাসে সতীসংঘে বুধবার বিকালে আসতে হয়; যদি তারা কষ্ট করে এসে কিছু নাই পরিবর্তিত হলো তাহলে তাদের কীসের লাভ হলো। এই সতীসংঘ সেবিকার নির্দেশে নয়, এতো শ্রীশ্রীঠাকুরের নির্দেশিত সতীসংঘ। সতীসংঘ করার ঠাকুরের উদ্দেশ্য কারণ যেখানে মেয়েরা হয়তো নীচে নেমে যাচ্ছে, তারা পথ খুঁজে পাচ্ছে না, তাদেরকে তোলার জন্য, তাদেরকে ভগবানের শ্রীচরণে পৌঁছে দেবার জন্যই ঠাকুর এই সংঘ করেছেন।

ঠাকুর মেয়েদের জন্য যে কত ভাবতেন তা সেবিকা দেখেছে। তখন শাড়ি হতো দশ হাতের। মেয়েরা অনেক সময় মাথার ঘোমটা পরে যাবে বলে মুখ দিয়ে ধরে থাকতো। কিন্তু ঠাকুর কাপড়টা এঁটো হয়ে যাচ্ছে বলে তাদের এ-কাজে কষ্ট পেতেন এবং সেবিকাকে অনেকবার জিজ্ঞাসাও করেছেন, "হ্যাঁরে মায়েদের বোধ নেই।" ঠাকুরের কষ্ট দেখে সেবিকা ঠাকুরের কাছে এর প্রতিবিধানের জন্য প্রার্থনা করেছেন; আর আজ ঠাকুরের কৃপায় ১২ হাত ১৪ হাত কাপড়ের আঁচল ধূলোয় লুটিয়ে যাচ্ছে। এভাবে ঠাকুর মায়েদের কথা সবসময় ভাবতেন। তাই যা করছেন ঠাকুর করছেন। গুরু যেভাবেই আশীর্বাদ করবে তা ফলবেই, যদি সেই শিষ্য বিশ্বাস রাখতে পারে। মানুষ না বুঝেই অনেক কিছু করে এবং সৎগুরু পেয়ে কখন যে পরিবর্তন আসে তা সে নিজেও বোঝে না। তাই সেবিকা মায়েদের কাছে 'আমি কি বা বুঝি, আমি কি বা জানি, আমি কেন ভেবে মরি'—এই গানের কথা বলে। সত্যি তো শ্রীশ্রীঠাকুর যা করার করবেন; আমরা কতটুকু জানি, কতটুকু বা বুঝেছি। শ্রীশ্রীঠাকুর যা কবার তিনিই করবেন। আমাদের যা দুঃখকষ্ট ভোগ করতে হয় তা আমাদের প্রারব্ধ। তা না হলে স্বয়ং ভগবান শ্রীকৃষ্ণকে কত দুঃখকষ্ট ভোগ করতে হয়েছে তাঁর সন্তান সাম্বর জন্য। কারণ সাম্ব সর্বজ্ঞ ঋষিকে ব্যঙ্গ করেছিল আর তার ফলস্বরূপ ঋষি অভিশাপ দিয়েছিলেন যে সাম্বর পেট থেকে মুষল বেরোবে এবং সেই মুষলই ধ্বংসের কারণ হবে। বলরামজী শ্রীকৃষ্ণকে ঋষির অভিশাপকে প্রতিরোধ করতে বললে ভগবান কিন্তু তা করেননি; ইচ্ছা করলেই তিনি তা করতে পারতেন। কিন্তু ঋষির অভিশাপ ফলবার জন্য তিনি তা করেন নি। প্রারব্ধ ভোগ করতেই হবে। ভগবান স্বয়ং কত কষ্ট সহ্য করেছেন। শুধু তাই নয় কুষ্ঠ ব্যধি নিয়েও সাম্ব কষ্ট পাচ্ছিল। তখন সন্তানের কষ্ট দেখে ভগবান শ্রীকৃষ্ণ তাঁর সন্তান সাম্বকে সূর্যদেবের উপাসনা করতে বলেছিলেন এবং সূর্যদেবের উপাসনা করতে করতে সাম্ব ভালো হয়ে যায়। ভগবানেরও যে কি কষ্ট হয় তাঁর সন্তানের জন্য তা সেবিকার নিজের চোখে দেখা। যখন শ্রীশ্রীঠাকুরের ভাইপো আমাদের বিমলদা দেহ রাখলেন তখন সেবিকা, লক্ষ্মীমা ঠাকুরের কাছে উপস্থিত ছিল, তখন ঠাকুরের কী কষ্ট, শুধু ছটফট করেছেন আর অঝোরে কেঁদে চলেছেন আর 'উঃ গেলাম, উঃ গেলাম' বলতে বলতে মাটিতে শুয়ে পড়েছেন। কারণ ঠাকুর তাঁকে মানুষ করেছেন তাই সে কষ্ট ভয়ানক। আজও সেবিকার মনে সে দৃশ্য নাড়া দেয়।

তাই সেবিকা যখন ভাবে শ্রীকৃষ্ণ, রাধারাণী, শ্রীশ্রীঠাকুরও কম কষ্ট পাননি তখন মানুষের এই কষ্টটাকে আর কষ্ট বলে মনে হয় না। প্রারব্ধ ভোগ তো আমাদের করতেই হবে, কিন্তু গুরুদর্শনে সব ভালো হয়ে যায়। আমরা যদি বলি আমাদের কোন দোষ নেই তবে তা ভুল বলি। আমাদের নিজেদের মাষ্টার নিজেদেরকে হতে হবে। দিনলিপি রাত্রে শোবার সময় মনে করলে আমরা আমাদের সব ভুল ভ্রান্তি শুধরে ফেলে ঠাকুরকে নিয়ে থাকতে পারবো। গুরুকৃপায় সব কষ্ট অনেক কম বলে অনুভব হয়। যাজ্ঞবল্ক্য মুনি এতবড় ঋষি কিন্তু গুরুশাপে তাঁর সমস্ত

বিদ্যা লুপ্ত হয়েছিল। তিনি একেবারে মূর্খ হয়ে গেছিলেন। তখন তিনি সূযদেবের উপাসনা করলে সূর্যদেব তাঁকে মা সরস্বতীর বন্দনা করতে বলেন। মা সরস্বতী তাঁর বন্দনায় খুশি হয়ে বর দেন যে তার এত বিদ্যা হবে যে মহান সর্বজ্ঞ হয়ে উঠবেন। অর্থাৎ শুধু স্তব স্তুতির প্রয়োজন। মহামূল্যবান সময়কে অকারণ বাজে কথা গল্পে নষ্ট করলে সে দিন সে তারিখটাকে আমরা আর ফিরে পাবো না। তাই সময়কে অকারণ নষ্ট না করে ঠাকুর কথা, তাঁকে স্বরণে মননে ধরে থাকতে হবে। অনুভবটাই সব থেকে বড়।

শ্রীশ্রীঠাকুর বলে গেছেন মায়েদের স্বামীসেবা সব থেকে বড় সেবা। তবে সবকিছুর ভেতরেই গুরুকৃপা চাই। গুরুকৃপায় সবই সম্ভব। শ্রীশ্রীঠাকুরের কৃপার কথা এ প্রসঙ্গে বলি। শ্রীশ্রীঠাকুর চোখ অপারেশনের পর তাপুরিয়া হাউস থেকে বর্ধমানে এসেছিলেন। ডাক্তারেরা বলেছিলেন মাটিতে ঘাসের ওপর হাঁটতে। ঠাকুরের ইচ্ছা ছিল সেবিকার কাছে জগন্নাথ নিবাসে থাকার। কারণ এখানে মা গঙ্গার ধারে ঘাসের ওপর হেঁটে বেড়াবেন। কিন্তু কারণবশতঃ বর্ধমানে ছিলেন। তাই সেবিকা বর্ধমানে সতীসংঘে গেলে ঠাকুর সেবিকাকে দেখেই জিজ্ঞাসা করেন যে সেবিকার কাছে না গিয়ে বর্ধমানে থাকায় সেবিকা খুব কষ্ট পেয়েছে কিনা। ঠাকুর তো অন্তর্যামী, তিনি সেবিকার মনের ব্যথা ঠিকই ধরে ফেলেছেন। এরপর ঠাকুর সতীসংঘের সব মায়েদের সামনে সেবিকা তাঁর কাছে কী চায় তা জিজ্ঞাসা করেন। সেবিকা তখন ঠাকুরকে জানায় তিনি যেন মায়েদের কৃপা করে ইষ্টগায়ত্রী দেন। শ্রীশ্রীঠাকুর সে কথায় সম্মতি দিলেন। চুঁচুড়ায় যখন সতীসংঘে এলেন তখন নিজে সেবিকাকে, শান্তামাকে প্রথমে দিয়ে তারপর একে একে মায়েদেরকে ডেকে খুশিমনে ইষ্টগায়ত্রী দেন। ঠাকুরের কাছ থেকে সেই চরম পাওয়াকে, সেই আনন্দ অনুভূতিকে আজও সেবিকা অনুভব করছে।

'গুরু' শব্দের অর্থ গভীর, কারণ গুরুই ব্রহ্মা, গুরুই বিষ্ণু, গুরুই মহেশ্বর। অর্থাৎ গুরুই সব। সেবিকা অনুভব করে জীবনে যা কিছু হচ্ছে সবই গুরুদেব করাচ্ছেন। ঠাকুর সেবিকাকে বলার শক্তি দিচ্ছেন, বাক্য তৈরী করে কথা বলাচ্ছেন। ঠাকুর একথা বলে গেছেন কলিযুগে যখন আমরা এসেছি তখন মা দুর্গা ছাড়া চলবে না। দুর্গানাম জপ করতে হবে। গুরুমন্ত্র, দুর্গামন্ত্র জপের দ্বারা আমরা ছয় রিপুকে জয় করতে পেরেছি কিনা, নিজেদের পরিবর্তন এসেছে কি না তা অনুভব করতে হবে। শ্রীশ্রীঠাকুরের কৃপায় সেবিকা গরিফায় জ্যোতির্ময় ঠাকুরের রূপকে কীভাবে অনুভব করেছিল সে কথাই এ প্রসঙ্গে বলবে। ঠাকুর গরিফায় মঞ্চে বসে ছিলেন। অসম্ভব ভিড়; যোগেন পণ্ডিতমশাই বসে আছেন, আর কিছুদূরে সেবিকা দাঁড়িয়ে আছে। এত ভিড় হয়েছিল যে কেউ কেউ অজ্ঞানও হয়ে যাচ্ছিল। সেইসময় যোগেন পণ্ডিত মহাশয় মঞ্চে দাঁড়িয়ে বলে যাচ্ছেন, 'তোমরা কে কোথায় আছো, ভগবান দেখবে চলে এসো'; খুব জোরে জোরে বলে চলেছেন—'ভগবান বসে আছেন তোমাদের সামনে'। আর সেবিকা তখন দেখছে অতো ভিড়ের মধ্যে অপূর্ব সাদা জ্যোতিতে পরিপূর্ণ ঠাকুর। এত জ্যোতি, এত জ্যোতি যে চারিদিক সাদা হয়ে গেছে। সে যেন এক অপরূপ দৃশ্য। যা ঘটে যায় তা ইতিহাস হয়ে যায়, আর ঈশ্বর কথা পুরাণে থেকে যায়। 'রামচরিত মানস'-এ পড়ি শ্রীরামচন্দ্রকে দেখিয়ে মুনিঋষিরা সকলকে আহ্বান করছে ভগবানকে দেখার জন্য। সেদিনও ঠাকুর যেন সেই ঘটনাই দেখালেন। সে এক অপূর্ব দৃশ্য। অতো ভিড় আর চোখে পড়ছে না। সেবিকার মনে হচ্ছিল যে হাজার পাওয়ারের কত বাল্ব সেখানে জ্বলছে। সেবিকার মন সেই অনুভবে পরিপূর্ণ হয়ে আছে। সেবিকার দীক্ষার প্রথম জীবনে যখন গোপালপুরে ঠাকুর চাতুর্মাস্য করছিলেন তখন প্রতিদিন বিকালে ঠাকুর পাঠে বসতেন আর সেসময় সেবিকা বাড়ি চলে আসার সময় দূর থেকে যখন শ্রীশ্রীঠাকুরকে দেখছেন, তখন দেখেন এক গোলাকার জ্যোতি ঠাকুরের পিছনে ঘুরেই চলেছে। আর সেসময় ঠাকুর সাণ্ডিল্যের পাঠ করছিলেন হাতটি উপর দিকে সোজা তুলে বলছিলেন 'সূর্যের গতিরোধ করেছিল কে? ভারতনারী।' ঠাকুরের সেই পাঠও সেবিকার মনকে নাড়া দেয়। তা সেবিকা একটুও ভোলেনি।

তাই সেবিকা বলে—ঠাকুর, তোমার যে কত মহিমা, কত লীলা, তা বলার নয়, সব সেবিকা বলে যেতে পারবে কিনা সেবিকা জানেন না। কারণ সময় দেবার, মনে করিয়ে দেবার মালিক ঠাকুর। ঠাকুর আমাদের যেখানে মরুভূমি সেখানেও মরুদ্যান করে রেখেছেন। ভগবানের লীলামাধুর্য সবসময়ই আছে, তা অনুভব করতে হবে। যে অনুভব করতে পারবে সে অপূর্ব লীলা আস্বাদন করবে যে পারবে না সে এই আস্বাদন করতে পারবে না—

"ওরে শ্রীগুরুর কৃপা ছাড়া, নাই কিছুরে সম্বল
আমার সুখে দুখে সকল সময়
শ্রীগুরু আমার সদা কাছে রয়।
কর্মফলে মোর বোঝা ভারী
গুরু মোরে দেয় হাল্কা করি।
আজ লীলা অভিরাম তাঁরই।
সেই যে মোদের সীতারাম তিনি সবারই।
কত লীলা গাহিব প্রভু
মিটে নাগো আশা কভু।
সারাজীবন ধরি, যেন লীলায় ডুবিয়া রই।।"

লীলাচিন্তা

বিমল কুমার মিশ্র

প্রথমেই লিখি জীবনে আমি বহু মহাপুরুষের সাক্ষাৎপ্রার্থী হয়েছিলাম একরকম বাধ্য হয়েই। এই বহুমহাপুরুষের মধ্যে আমার কাছে শ্রীশ্রীসীতারামদাস ওঙ্কারনাথ ঠাকুর অন্যতম, কারণ ১০০০ লোকের মধ্যে থেকে ঠাকুর কিভাবে আমায় নিজের কাছে টেনে নিয়েছিলেন। আজ থেকে প্রায় বছর ৩৫-৩৬ বছর আগেকার ঘটনা। সেদিন ছিল ঠাকুরের জন্মদিন। স্থান হাওড়ার বালটিকুরীর সদানন্দ মঠ। নদের নিমাই যাত্রার আয়োজন করা হয়েছিল। আমি আমার এক বন্ধুকে সঙ্গে নিয়েই বাবার (ঠাকুরের) সাক্ষাৎপ্রার্থী হয়েছিলাম। আমি কিন্তু নিজের স্বার্থের জন্যেই গিয়েছিলাম। বৈকাল ৫টা নাগাদ সদানন্দ মঠে পৌঁছিয়েছিলাম। কিন্তু ঠাকুর তখনও পর্যন্ত এসে পৌঁছয়নি, অতএব যাত্রাও আরম্ভ হয়নি। অবশ্য ঠাকুর যতক্ষণ না উপস্থিত হবেন, ততক্ষণ যাত্রাও শুরু হবে না। আমি প্রথমে ঠাকুরের এক শিষ্যের সহিত গায়ে পড়ে আলাপ করিলাম। কারণ আমি কাহাকেও জানি না, চিনি না। আমি শুধু ওঙ্কারনাথ ঠাকুরের নাম শুনেছিলাম। শুনেছিলাম উনি একজন মহাপুরুষ, দেখিলাম সময় যতই বাড়ছে, ভীড়ও ততই বাড়ছে, কারও through দিয়ে না গেলে কাছে যাওয়াই যাবে না। আমার যে উদ্দেশ্যে যাওয়া, কাছে গিয়ে অন্ততঃ মিনিট ১৫-২০ কথা বলতেই হবে, কিন্তু ব্যাপার-স্যাপার দেখে তো চক্ষু চড়কগাছ, আমিও কিন্তু ছাড়ার পাত্র নই। আর আমার একটা আত্মবিশ্বাস আছে, প্রকৃত মহাপুরুষ হলে আমাদের সাক্ষাৎ হবেই। প্রথমে এক ভদ্রলোককে বলিলাম দাদা একটা কথা আছে, ভদ্রলোক বলিলেন, বলুন। আমি বলিলাম, আচ্ছা কিভাবে আপনার গুরুদেবের সহিত সাক্ষাৎ করা যাবে। ভদ্রলোক ঠিক এইভাবে বলিলেন, আপনার মাথা খারাপ! আজ ঠাকুরের জন্মদিন, আপনি প্যাণ্ট-সার্ট পরে আছেন, ওনার সহিত সাক্ষাৎ করিতে হইলে অবশ্যই আজকে ধুতি-পাঞ্জাবী পরে (বাবার) ঠাকুরের কাছে যেতে হবে। সঙ্গে সঙ্গে আমিও জবাব দিলাম, তা হলে স্কুল ছাত্ররাও কি ধুতি পরে আসবে? ভদ্রলোক বুঝিলেন আমি একদম নূতন, কথা আর বাড়ালেন না, আস্তে আস্তে সরে পড়লেন। মঠের বেদিতেই বাবার মঞ্চ তৈরী হয়েছে। মেঝে একটু উঁচু। কাছেই কয়েকটি সিঁড়ি দিয়ে মঞ্চে উঠতে হবে।

সামনে প্রচুর লোকের বসার জায়গা। বড় বড় ফাংশনের মতো বাঁশের ব্যারিকেড দেওয়া। ঠাকুরের কাছে যেতে হলে ৫-৭টা বাঁশের পার্টিশন টপ্‌কে যেতে হবে। হঠাৎ হৈ হৈ, চীৎকার, বাবা (ঠাকুর) এসে গেছেন। একটি সাদা অ্যামবাস্যাডারে করে প্রবেশ করলেন। পিছনে আরও ৭-৮টা গাড়ী। বুঝলাম এরা সবাই ঠাকুরের কাছের লোক, সবাই ধুতি-পাঞ্জাবী পরে আছে। বাবার গাড়ীর চাকায় অনেকে জল ঢালিতেছিল, কেউ কেউ গাড়ির চাকার ধুলো মাথায় নিল। যাইহোক ঠাকুরকে গাড়ি থেকে নামিয়ে কয়েকজন কাছের শিষ্য ধরে নিয়ে মঞ্চের উপরে একটি কাঠের ইজি চেয়ারে বসিয়ে দিলেন। ১০-১২জন ধুতি-পাঞ্জাবী পরিহিত হোমরা-চোমরা ব্যক্তি ঠাকুরকে ঘিরে রাখলেন। ঘড়িতে তখন ৬টা থেকে ৭টার মধ্যে হবে, আমি তো আমি, বাবার দীক্ষিত শিষ্যরাই কাছে যেতে পারছেন না। আমি প্রায় মঞ্চ থেকে ২০-২২ গজ দূরে দাঁড়িয়ে বাঁশের ব্যারা ডিঙিয়ে ঢুকতে চেষ্টা করলাম। পুলিশ ও ঠাকুরের শিষ্য দুইয়ে মিলে আমায় বার করে দিল। আমি কিন্তু হাল ছাড়িনি, দূর থেকে বাবার দিকে চোখ পড়তেই মনে হল বাবার আমার দিকেই তাকিয়ে আছে। ভাবতাম

মনের ভুল, কিছুক্ষণের জন্য অন্যদিকে চোখ সরিয়ে নিলাম, পরে দেখলাম না আমার মনের ভুল নয়, বাবা আমার দিকেই তাকিয়ে আছেন। ঠিক সেই সময় এক ভদ্রমহিলা তার ৯ বৎসরের পুত্র সন্তানকে কোলে নিয়ে হাঁটু পর্যন্ত উঁচু বাঁশের পার্টিশান টপকিয়ে একবারে মঞ্চের সামনে উপস্থিত হইলেন। দেখলাম ভদ্রমহিলা অনেক শিষ্যের পরিচিত, কোনরকম বাধা আসিল না, কিন্তু মঞ্চের সামনে গিয়ে বড়রকম বাধার সামনে পড়িলেন। ধুতি-পাঞ্জাবী পরিহিত ১০-১২জন কাছের শিষ্য পথ আটকে দাঁড়ালেন। বললেন আজ কোন মহিলার সহিত কথা বলবেন না। মহিলা তখন বললেন, বাবার আশীর্বাদেই আমার পুত্রসন্তান, বাবার আমি দীক্ষিত শিষ্যা, বাবার কাছে আমার মানত (মানসিক) আছে যে, আমার পুত্রের যখন ৯ বছর বয়স হবে, তখন বাবার পায়ে ফুল দিয়ে প্রণাম করে, তবেই মাথার চুল কাটাবো। অর্থাৎ ন্যাড়া করে দেব। ভদ্রমহিলা কোন কথাই শুনছেন না, আর শিষ্যরাও ছাড়ছে না। এই সুযোগে আস্তে আস্তে এগোতে লাগলাম মঞ্চের দিকে। ভদ্রমহিলাও নাছোড়বান্দা, দেখলাম কয়েকজন কাছের শিষ্যর সঙ্গে বিরাট বচসা হচ্ছে। ভদ্রমহিলাও জোর করে দুটো সিঁড়িতে উঠে পড়লেন। ঠিক সেই সময় ধুতি-পাঞ্জাবী পরিহিত দুজন শিষ্য ভদ্রমহিলাকে সজোরে ধাক্কা দিয়ে ফেলে দিলেন। ভদ্রমহিলা পড়ে গিয়ে কাঁদতে লাগলেন। সুযোগের অপেক্ষায় ছিলাম, বাঁশ টপ্‌কে সোজা মহিলার কাছে, ভদ্রমহিলা খুব কাঁদছেন। ছেলেটাকে কোলে তুলে নিলাম, পুলিশ এবং ধুতি-পাঞ্জাবী পরিহিত কাছের শিষ্যদের উদ্দেশে বললাম, আপনাদের লজ্জা করে না, একজন মহিলার উপর মস্তানী, দেখি আমাকে কে আটকায়। আটকাতে চেষ্টা করলে আমিও হাত চালাবো। দেখলাম কেউ কিছু বলল না। আমি এবং আমার বন্ধু ছেলেটিকে কোলে নিয়ে একেবারে বাবার পায়ের সামনে, ছেলেটিকে কোল থেকে নামিয়ে, ছেলের হাতের মালাটি বাবার পায়ে দিয়ে প্রণাম করতে বললাম, ছেলেটি তৎক্ষণাৎ বাবার পায়ে মালা দিয়ে প্রণাম করল। বাবা সেই মালাটি ছেলেটির গলায় পরিয়ে দিয়ে মাথায় হাত দিয়ে আশীর্বাদ করিলেন। ছেলেটির মা কিন্তু কাছে আসতে পারলেন না, ছেলেটিকে কোলে তুলে মায়ের কাছে দিয়ে দিলাম। ছেলের মা (ভদ্রমহিলা) আমায় খুব আশীর্বাদ করলেন, আমি তখন মনে মনে ভাবছি, তোমার কাজ হয়েছে, এবার বাড়ি যাও, আমার কাজটা করতে দাও। আবার সোজা মঞ্চের উপরে গিয়ে একেবারে বাবার সামনে দাঁড়ালাম। মঞ্চ একেবারে ফাঁকা, ধুতি-পাঞ্জাবী পরিহিত শিষ্যরা আর ধারে কেহ নাই, মঞ্চে আমরাই দুজন প্যান্ট-সার্ট পরিহিত। সেই মুহূর্তে বাবার উপরেও খুব রাগ ধরছিলো। তোমার চোখের সামনে এতবড় একটা ঘটনা ঘটে গেল আর তুমি চুপচাপ বসে আছো। আমাকে কাছে ডাকলো, একেবারে ইজি চেয়ারের বাঁদিকের হাতের কাছে দাঁড়ালাম, হঠাৎ আমাকে বলিলেন, তুই তো ব্রাহ্মণের ছেলে, তোর গায়ে পৈতে নেই কেন? আমি উত্তর দিলাম বাবা আমি তো রোজ পুকুরে স্নান করি। দেড়ঘণ্টা সাঁতার কাটি, ভীষণভাবে গায়ে-হাতে জড়িয়ে যায় সেইজন্যই খুলে ফেলে দিয়েছি। উনি (বাবা) সঙ্গে সঙ্গে বললেন, তুমি বাড়ি গিয়ে কাল সকালেই আগে পৈতে পরে নেবে, আমি বললাম ঠিক আছে, ঠিক সেই মুহূর্তেই ঝ্যাং ঝ্যাং ঝ্যাং আওয়াজ অর্থাৎ যাত্রা আরম্ভ হইল। বাবার হাতে একটা জোয়ানের পুঁটলি ছিল, নিজে কিছুটা নিল, আর আমাকে আর বন্ধুকে কিছুটা দিল, হঠাৎ দেখি বাবার মাথার কাছে একজন সাদা কাপড় পরিহিত জটাধারী সন্ন্যাসী, মঞ্চে তখন বাবাকে নিয়ে চারজন, বাবার কাছ থেকে সরে গিয়ে ঐ সন্ন্যাসীকে বললাম, এ কিরকম ব্যাপার, আপনাদের সামনে একজন মহিলাকে ঠেলে ফেলে দিল, আর আপনারা দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে দেখলেন! উনি তখন আমায় বললেন, এসব বাবার সৃষ্টি, বাবাই এইরকম পরিবেশ তৈরী করেছেন, কারণ তোমার কথা শুনলে প্যান্ট-সার্ট পরে এভাবে আজ বাবার কাছে আসতে পারতে না, বাবাতো ছেলেটির মালা নিলো, কিন্তু বাবা ভালো বুঝেছে ভদ্রমহিলাকে কাছে আসতে দেয়নি। তখন মনে হচ্ছে বাবা শুধু আমাদের যা খুশী

তাই করবো, বাবার কাছে একটি বড় লাঠি ছিলো, লাঠিটার গায়ে ওঁ আরও কি সব লেখাছিল, লাঠিটা বাবার কাছ থেকে নিয়ে বেশ করে গায়েপিঠে বুলিয়ে নিলাম, ঠিক সেই সময়ে দেখি ঠাকুর আমার দিকে তাকিয়ে আছে, ব্যাস আমিও বসে পড়লাম। অবশ্য সময় তখন অনেক ছিল, যাত্রা শেষ হতে তখনও ২-৩ ঘণ্টা বাকী, বাবাকে বললাম, অনেক লম্বা ঘটনা, আমার জন্মসময় থেকেই ঘটে চলেছে। বাবা বলিলেন ঠিক আছে যতটা সম্ভব বল না, বাবাকে বলতে শুরু করলাম।

বাবা আমি এক মহাশক্তির কথা বলছি, যিনি পরিচয় দিয়াছেন নিজেকে ব্রহ্মার দূত বলে। যতদূর মনে হয় আমার তিন বছর বয়স থেকে এই শক্তির যাওয়া আসা আমার কাছে। কখনও বয়স্ক পুরুষের রুপ ধরে, কখনও বিধবা মহিলার, কখনও মা-বোনের, কখনও প্রিয়বন্ধুর ছদ্মবেশে, যে কোন একদিন দুপুরের দিকে বিবেকানন্দের রূপ ধারণ করে এসেছিলেন। অতএব এই মূর্তির ছদ্মবেশের কোন ঠিক নেই। আমার যতদূর মনে হয় শিশু অবস্থায় মায়েরই সাজে এই সত্তা সবসময় আমার আশেপাশে থাকতো। এমনকি এই সত্তার স্পর্শও শিশু অবস্থা থেকেই পেয়ে আসছি। সম্পূর্ণ রক্তমাংস মানুষের হাত—এইবার বলছি যখন ঐ সত্তা আমাকে স্পর্শ করতো বা এখনো করে, তখন আসার আগেই আমার গোটা শরীরটাকে অবশ করে দেয়। একদম নড়াচড়া করতে পারি না। (অর্থাৎ ডাক্তার কোন বড় অপারেশানের আগে যেমন ঐ জায়গাটা বা সময় বিশেষে গোটা শরীরটা অবশ করে দেয়) দিন/রাত্রি, ভরদুপুর/সন্ধ্যা সময়ের যেমন ঠিক নেই, সেরকম স্থানেরও কোন ঠিক নেই। আজ ভারতবর্ষের বহু স্থানে গিয়াছি। এই সত্তা সেখানেও হাজির। যেমন কাশ্মীর, অমরনাথ, আবার কেদারনাথ, বদ্রীনাথ। ট্রেনের কামরাতেও কোথাও বাদ নেই। শিশু অবস্থায় ভাবতাম, আমি যা দেখছি হয়তো সকলেও তাই দেখছে কিন্তু একাদশ শ্রেণী উত্তীর্ণ হবার পর বুঝতে পারলাম এই জিনিসটা শুধু আমিই দেখতে পাই। যখন এই সত্তার হাতটা স্পর্শ করতো, শরীরটা অবশ হয়ে যেত, কথা বলা বন্ধ হয়ে যেত। হাতের আঙুল নাড়াতে চেষ্টা করি পারিনা, খুব জোরে চীৎকার করতে চেষ্টা করি, কিন্তু অল্প আওয়াজও পাশের লোক শুনতে পায়। ঐ সময় আমার ভীষণ কষ্ট হয় ২-৩ মিনিট। চীৎকার করি এইজন্যই পাশের লোক যাতে ঠেলে দেয়। উনি যখন স্পর্শ করতেন, ঐ সময় অন্য কোন হাত আমার শরীর স্পর্শ করলে উনি সঙ্গে সঙ্গে ছেড়ে দিতেন। ঐ অবশ অবস্থায় আমার চোখটা শুধু এদিক ওদিক করতে পারতাম। কাজেই পরিষ্কার দেখতাম ওনার চোখ হইতে সরু সুতার মতো জ্যোতি আমার শরীরে পড়িত। কখনও বা আশীর্বাদের মতো হাত তুলিত, হাতের তালু হইতেও জ্যোতি বাহির হইয়া অবশ করিয়া দেয় (আজ এই প্রায় ৬০ বছর বয়সেও ঐ একই জিনিস চলছে) ছোটবেলায় দিনেরাতে ৫-৬ বার এরূপ ঘটনা ঘটত। বাবা প্রচণ্ড রেগে যেতেন, সারাদিন পরিশ্রম করে ভালোভাবে ঘুমোতে পারতেন না, কারণ আমার চীৎকারে। আমার ৮-১০ বৎসর বয়সে একদিন আমার মামার বাড়ীর কালীঠাকুরকে দেখলাম। আস্তে আস্তে মন্দির থেকে বেরিয়ে এসে আমার সামনে দাঁড়িয়ে খিলখিল করে হাসছে। আমি মামার বাড়ির দালানে বসে আছি।

আমার একপাশে দাঁড়িয়ে তখন দাদুর একভাই, আমি ওনাকে ডেকে বললাম, দাদু মন্দির থেকে ঠাকুর বেরিয়ে। দাদু এলেন এবং বললেন কোথায়? আমি তখনও স্পষ্ট দেখতে পাচ্ছি। কিন্তু আমার দাদু কিছু দেখতে পাচ্ছিলেন না। কালী মা আরও বেশী করে খিলখিল করে হাসতে লাগলো। দাদু রেগে গিয়ে বেশ করে কানটা মুলে দিলেন, আর বলতে লাগলেন, এই বয়স থেকেই মিথ্যে কথা। মা তখনও হেসে চলেছেন। আমিও কিছু দাদুকে আবার বললাম, কিগো তুমি দেখতে পাচ্ছো না, প্রচণ্ড রেগে গেলেন, কাছে এগিয়ে এলেন, মাথায় সজোরে এক গাট্টা, ত্রিভুবন অন্ধকার দেখলাম, এবং শুনতে পাচ্ছিলাম দাদু বলেই চলেছে এই বয়স থেকেই মিথ্যে কথা, গুলবাজ, ধাপ্পাবাজ, এর কিছুদিন

পর বাবা আমায় পড়াচ্ছিলেন। হঠাৎ দেখতে পেলাম—ছোট নাড়ুগোপাল খুব সুন্দর দেখতে আমার এবং বাবার মাঝখানে বসে আছে, গায়ে গয়না পরে। বাবাকে বললাম, দেখো কি সুন্দর ছেলেটা বসে আছে। বাবা জিজ্ঞাসা করিলেন কোথায়? বাবাকে দেখিয়ে বললাম, এই ছেলেটা, বাবা কিছুই দেখতে পাচ্ছিলেন না, ব্যাস, তারপর সপাটে কসিয়ে গালে এক থাপ্পড় এবং ঐ এক কথা। মিথ্যেবাদি, যাতে পড়তে না হয়, সেইজন্যই এইসব বাহানা, মনে মনে খুব কষ্ট পেতে লাগলাম। আমি যেটা দেখতে পাচ্ছি, আর কেউ সেটা দেখতে পাচ্ছে না কেন! শ্রীশ্রীঠাকুরকে বললাম কত ঘটনা বলবো, ঠাকুর খুব আগ্রহ নিয়ে আমার কথাগুলো শুনছিলেন, এবং বলিলেন তুই বলনা শুনতে ভালো লাগছে। আবার বলতে শুরু করলাম। নানারকম অলৌকিক ঘটনার মধ্যে দিয়ে বড় হতে লাগলাম সঙ্গে মিথ্যেবাদি আখ্যা পেলাম, কেউ আমার কোন কথা বিশ্বাস করে না যখন আমি নবম/দশম শ্রেণীর ছাত্র, তখন আমার বাবার মধ্যে একটা চিন্তা শুরু হলো। ১৪-১৫ দিন ধরে একই ঘটনা বলে চলেছে। নিশ্চয় কিছু একটা ঘটছে, কারণ রাত্রিবেলায় বা দিনেরবেলায় যখন বুঝতাম খুব জোরে (হঠাৎ হঠাৎ করে) চিৎকার করতাম। সবার ঘুম ভেঙে যেতো। আমি কিন্তু সজ্ঞানে চিৎকার করতাম, আমার পাশে যে থাকতো ঠেলে দিতো আর ও সঙ্গে সঙ্গে ছেড়ে দিতো। আমি চুপ করে যেতাম।

একটা সময় বাবা আর থাকতে না পেরে ডাক্তার দেখানোর চিন্তা করতে লাগলেন। ৯ই আগষ্ট ১৯৭৭ এন.আর.এস. হাসপাতালে যোগাযোগ করি, যোগাযোগ করিয়ে দিয়েছিলেন আমাদের পরিচিত এক ডাক্তার চঞ্চল ব্যানার্জী। কাজেই সমস্ত রকম চিকিৎসা হলো, কোন পরীক্ষা বাকি রইল না। অবশেষে ডাক্তারবাবু বললেন আমার ডাক্তার হিসাবে বলা উচিত নয়, তবুও বলছি। আপনার মস্তিষ্ক খুবই পরিষ্কার, কোনরকম গণ্ডগোল নেই, বহির্জাগতিক কিছু একটা জিনিস আছে যেটার স্পর্শ বা অনুভূতি শুধু আপনি পান এবং এও আপনাকে নিষেধ করে দিচ্ছি, আপনি এই ব্যাপারে আর কোন ডাক্তারের কাছে যাবেন না। আস্তে আস্তে হায়ার সেকেণ্ডারী পাশ করে গেলাম, কলেজে ভর্তি হলাম, কিছু ভালো লোকের কথায় বুঝতে শিখলাম, আমায় কিছু একটা ধরে আছে, তখন শুরু হলো অন্য চেষ্টা। ভূত/ব্রহ্মদত্যি তাড়ানো, ঝাড়ফুক, মনে মনে চিন্তা করলাম একে আমি তাড়াবোই। ব্রাহ্মণের ছেলে হলে কি হবে, পূজা-আচ্চা আমার কোনদিন ভালো লাগতো না। আমি অন্য পরিবেশে মানুষ, বাবা অভিনয় করতেন ডঃ রমাচৌধুরীর দলে (রাষ্ট্রপতি পুরস্কার প্রাপ্ত), আর মা ছিলেন সঙ্গীতশিল্পী (স্বর্ণপদক প্রাপ্তা)। আমি ঐ জীবন চেয়েছিলাম, বুঝতে পারলাম আমাকে ঘুরতে হবে সাধুসন্তদের দরবারে, নাম করা বহু বড়বড় মহাপুরুষের সাথে সাক্ষাৎ করিয়াছিলাম, কিন্তু কেউ এই অশরীরী শক্তিকে আমার পাশ ছাড়া করতে পারেনি, অনেকে (মহাপুরুষ) চেষ্টা করেছেন না পেরে হার স্বীকার করে নিয়ে ভগবানরুপে শ্রদ্ধা জানিয়েছেন। আর বলেছেন তুমি ভাগ্যবান, বহু জনমের সাধনার ফল, যাইহোক শ্রীশ্রীসীতারামদাস ওঙ্কারনাথঠাকুরকে বলিতে লাগিলাম কিভাবে নিজেকে (শক্তিটা) ব্রহ্মার দূত বলে পরিচয় দিলে, আবার বলছি ওঙ্কারনাথঠাকুর খুবই খুশী হয়ে শুনছিলেন, চারিদিকে ছুটছি ভূত/ব্রহ্মদত্যি তাড়ানোর উদ্দেশ্যে সবেমাত্র হায়ার সেকেণ্ডারী পাশ করেছি, আমাদের আদি বাড়ি বর্ধমানে, (বর্তমানে হাওড়ায়) আমার এই ব্যাপারটা আমার সেজ-জ্যাঠাইমার কানে গিয়েছিল, জ্যাঠাইমা সব শুনে আমার বাবাকে বলেছিলেন, তুমি ছেলেকে একবার আমার বাড়িতে পাঠিয়ে দাও। এখানে বর্ধমানে কলেজ মোড়ের থেকে বেশ খানিকটা দূরে ভূতনাথ বাবার মন্দির আছে। ঐ মন্দিরে এক বৃদ্ধা আছেন। উনি এইসব ব্যাপারে সিদ্ধহস্ত। ওনার ঘরেও ভূতনাথ বাবা নিজে এসেছিলেন। সেই মতো আমি একদিন সকাল ১০টার সময় ভূতনাথ বাবার মন্দিরে হাজির হলাম।

ক্রমশঃ

যীশুখ্রীষ্ট, তৎঅনুরাগী ও শ্রীশ্রীঠাকুর

কিঙ্কর শরণানন্দ

যীশুখ্রীষ্ট হলেন খ্রীষ্টধর্মের প্রবর্ত্তক। অধিকাংশ খ্রীষ্টানরাই তাঁকে ঈশ্বরের পুত্র বলে মনে করেন। দুই সহস্রাধিক বৎসর পূর্বে ইজরায়েল-এ তিনি জন্মগ্রহণ করেন। তাঁর জীবনের অধিকাংশ ঘটনাই নুতন নিয়মের (নিউ টেস্টামেণ্ট-এর) চারটি সমাচারে লিখিত আছে। যেগুলির নাম যথাক্রমে (১) ম্যাথিউ, (২) মার্ক, (৩) লিউক ও (৪) যোহন। কিন্তু এই গল্পগুলি তাঁর জীবনের আসল গল্প নয়। সম্ভবত ২-৬ খ্রীষ্টপূর্বাব্দে 'বেথলেহেম' গ্রামে (বর্তমান ওয়েস্ট ব্যাঙ্কের একটি অংশ) যোশেফ নামে এক ছুতোর মিস্ত্রির বাগ্‌দত্তা কুমারী মেরীর গর্ভে একটি আস্তাবলে যীশুর জন্ম হয়। 'ম্যাথিউ'-এর মতানুসারে 'হেরোদ' রাজার রাজত্বে যীশুর জন্মের পর তাঁকে নিয়ে নানা অলৌকিক ঘটনা ঘটায়—রাজা আতঙ্কিত হয়ে আদেশ করেন যে দু বছরের কম বয়সের সব শিশুকেই যেন হত্যা করা হয়। সৌভাগ্যক্রমে একজন দেবদূত যোশেফকে সাবধান করে যান। সেইজন্য তিনি স্ত্রী ও নবজাতক শিশুকে নিয়ে মিশরে চলে যান। পরে হেরোদ রাজার মৃত্যুর পর পুনরায় ফিরে এসে 'গ্যালিলি'র অন্তর্গত 'নাজারেথ' নামক স্থানে বসবাস করতে থাকেন।

যীশুর বাল্যকাল সম্বন্ধে বিশেষ কিছু জানা যায় না। তবে এটা বিশ্বাস করা হয় যে তিনি তাঁর কৈশোর পর্যন্ত তাঁদের জাত-ব্যবসা ছুতোরের কাজ করেই কাটিয়েছিলেন। তাঁর প্রভূত্বকাল শুরু হয় ত্রিশ বছর বয়স থেকে। ঐ সময়ে তাঁর 'বাপ্তিস্মদাতা' (দীক্ষাদাতা) 'যোহন'-এর সঙ্গে তাঁর সাক্ষাৎ হয়। যিনি তাঁকে ঈশ্বরের পুত্ররূপে দর্শন করেন এবং 'জর্ডন' নদীতীরে তাঁকে বাপ্তিস্ম দান করেন। বাপ্তিস্ম গ্রহণের পরই তিনি মরুভূমিতে চলে গিয়ে একাদিক্রমে চল্লিশ দিন-রাত্রি অনাহারে থেকে জপ-ধ্যান-তপস্যাদি করেন।

এরপর যীশুখ্রীষ্ট দেশ ভ্রমণ শুরু করেন এবং নানা অলৌকিক ঘটনা দেখাতে থাকেন, ধর্মশিক্ষা দেওয়াও শুরু হয়। এইভাবে তিনবছর কেটে যায়, ক্রমে তাঁর প্রভাব বাড়তে থাকে। তখন রোমান শাসকরা এবং ইহুদি নেতাগণ বুঝলেন যে যীশু তাঁদের স্বার্থের পক্ষে বিপদজনক। কারণ যীশু সেইসময় নিজেকে ঈশ্বরের দূত বলে দাবি করতেন—যেটা ইহুদিদের আইনের বিরোধী ছিল। ইহুদি নেতাগণ যীশুকে ফাঁসি দেবার জন্য রোমানদের উদ্বুদ্ধ করতে লাগলেন। দক্ষিণ ইজরায়েলের শাসক (পাইলেট) এই ফাঁসি দানের অনুমতি দেন। শুরু হল যীশুখ্রীষ্টের উপর নির্মম অত্যাচার। শেষ পর্যন্ত তাঁকে ক্রুশবিদ্ধ করা হয়। তখন তিনি তিনঘণ্টার মধ্যেই মারা গিয়েছিলেন।

তিনদিন পরে তাঁর মৃতদেহে প্রাণ ফিরে আসে—শতশত লোক এই ঘটনার সাক্ষী ছিলেন। অতঃপর চল্লিশ দিন যাবৎ তিনি বিভিন্ন স্থানে পরিভ্রমণ করার পর 'জেরুজালেমে' ফিরে আসেন এবং সেখানেই উর্দ্ধাকাশে উঠে অদৃশ্য হয়ে যান! এই ঘটনার পর তাঁর অনুগামীর সংখ্যা দিন দিন বাড়তে থাকে। 'নিকোলাস নটোভিচ্'-এর লেখা একটি পুস্তকে পাওয়া যায় ক্রুশ বিদ্ধ হওয়ার পর যীশু ভারতে আসেন এবং ভারতেই (কাশ্মীর অঞ্চলে) দেহত্যাগ করেন। এই তথ্যটি শ্রীরামকৃষ্ণ শিষ্য স্বামী অভেদানন্দ বিশ্বাস করতেন এবং পুস্তকে লিপিবদ্ধ করেছেন। শ্রীরামকৃষ্ণ মিশনে ২৫শে ডিসেম্বর দিনটিকে বিশেষভাবে পালন করা হয়।

যীশুখ্রীষ্টের অনুগামী—খ্রীষ্ট ধর্মাবলম্বী বহু ভক্ত মানুষ আমাদের পরমারাধ্য গুরুদেব শ্রীশ্রীঠাকুরের সংস্পর্শে এসেছেন এবং তাঁর স্নিগ্ধ স্নেহচ্ছায়ায় নিজেকে ধন্য ও গবির্ত করেছেন—কেউবা উচ্চকণ্ঠে 'ঠাকুরকেই' সাক্ষাৎ 'যীশুখ্রীষ্ট' বলে উল্লিখিত করেছেন। কেউ কেউ বা দিনের পর দিন, মাসের পর মাস ঠাকুরের কাছেই অবস্থান করেছেন। ধুতি, কেউবা সাদা কাপড়ের বহির্বাস পরেই কাটিয়ে দিয়েছেন। শ্রীশ্রীঠাকুর তাঁদের খ্রীষ্টধর্মেরই মন্ত্রদান করেছেন, যীশুখ্রীষ্টকেই

স্মরণ করতে বলেছেন---ধর্মান্তরকরণ করাননি। তারা স্বতঃপ্রণোদিত হয়ে—

''হরে কৃষ্ণ হরে কৃষ্ণ কৃষ্ণ কৃষ্ণ হরে হরে।
হরে রাম হরে রাম রাম রাম হরে হরে।।''

—নামগানে মাতোয়ারা হত।

কলিযুগের এই 'তারকব্রহ্ম' নামই গান করেছেন। অনুভূতি লাভও করেছেন---বহু ঘটনাও দেখেছি। শ্রীশ্রীঠাকুরের প্রেমে তাঁরা এত মশগুল হয়ে থাকতেন যে ব্যবহারিক অনেক অসুবিধা-কষ্টকেও কোনরকম প্রাধান্য দিতেন না। তাঁদের মুখের অনাবিল হাসিই বুঝিয়ে দিত তাঁরা কত আনন্দে আছেন। শ্রীশ্রীঠাকুর তাঁদের দেশের নিজস্ব নাম পাল্টে তাদের ডাকতেন ---মোহনানন্দ, কৃষ্ণানন্দ, দুর্গানন্দ, নবীনানন্দ, যোগানন্দ, যোগামায়া, নারায়ণী প্রভৃতি নামে। বলতেন—'দ্যাখ্, ওরা এদেশেরই লোক ছিল, দুষ্ট প্রারব্ধের বশীভূত হয়ে কোন অনাচার করায় ওদেশে গিয়ে জন্মেছে—কিন্তু এদেশের প্রতি, এদেশের ভগবানের প্রতি টানটা রয়েই গেছে—তাই বারবার ছুটে ছুটে আসছে।'

কানাডার লোক---কৃষ্ণানন্দ। দীর্ঘদিন ধরে শ্রীশ্রীঠাকুরের কাছে আছেন। একদিন শ্রীশ্রীঠাকুর কন্যাকুমারী মন্দির দর্শন করতে গিয়ে নিকটবর্তী দোকান থেকে একটি শ্রীকৃষ্ণের মূর্তি ও একটি যীশুখ্রীষ্টের মূর্ত্তি কিনে এনে কৃষ্ণানন্দের হাতে দিলে কৃষ্ণানন্দ ভাঙা ভাঙা বাংলা, হিন্দি ও ইংরাজী মিশিয়ে বলল—বাবা, কৃষ্ণের হাতে বাঁশী কত সুন্দর কিন্তু যীশুর হাতে তা নেই, তাই ভাল লাগছে না।

বাবা—'ওই জন্যই তো সব ওদেশ থেকে পালিয়ে আসছে, ওই বাঁশী শোনবার জন্য।'

কৃষ্ণানন্দ—বাবা, very sweet song.

আর একদিন কৃষ্ণানন্দ করতাল নিয়ে নাম করতে করতে উল্টে পড়ে গেলো। কি হলো! কি হলো! করে চোখে মুখে জলের ঝাপ্টা দিতেই ছুটে এসে সে চীৎকার করে উঠলো—'Light-Light'.

কৃষ্ণানন্দ একসময় জানালো 'ক'দিন আগে কোন কারণে অভিমান করে হোটেলে থাকতে গিয়েছিলাম, কিন্তু বাবার জন্য এত মন কেমন করছিল যে চলে এলাম।'

কৃষ্ণানন্দ যে সময় হোটেলে থাকতে গিয়েছিল সেই সময় আর একজন সাহেব (নবীনানন্দ) কৃষ্ণানন্দের খোঁজে এসে ঠাকুরকে পেয়ে এখানেই মজে গেলো। বেশ কয়েকদিন ঠাকুরের কাছে কাটিয়ে মন্ত্র-টন্ত্র নিয়ে সে যেদিন চলে গেলো সেইদিন রাত্রেই কৃষ্ণানন্দ ফিরে এল। ইতিমধ্যে কৃষ্ণানন্দের থাকার জায়গার পাশেই শ্রীনামমঞ্চ হয়েছে। বাবা তাকে দেখেই বললেন— 'Come here, come here. I am occopy your place, but liedown place no occopy. Your friend come. Take Mantra, and this day go. I present your friend a tulasimala.'

U.N.S.C.O. এর প্যারিস শাখার উচ্চপদস্থ কর্মী শ্রীশ্রীবাবার আশ্রিতা—কিঙ্করী নারায়ণী। শ্রীশ্রীবাবার দেওয়া লালপেড়ে শাড়ী পরিহিতা সদাহাস্যময়ী 'কিঙ্করী নারায়ণী' যেন ভক্তিরাণীর প্রতিমূর্তি। যথেষ্ট গুরুত্বপূর্ণ পদে চাকুরী করায় তার ছুটি ও সময় খুবই কম—তথাপি ছুটে ছুটে আসেন ভারতে শ্রীশ্রীবাবার সঙ্গ লাভেচ্ছায়। বিমান থেকে দিল্লিতে নেমে—প্রথমে যান হৃষিকেশে। সেখান থেকে বাবা কন্যাকুমারীতে আছেন শুনেই ছুটে এসেছেন কন্যাকুমারীতে। তাকে দেখে শ্রীশ্রীবাবারও খুব আনন্দ!

নারায়ণী—বাবা, বহুদূর থেকে আসছি, কিন্তু মেয়াদ মাত্র ৫ দিনের।

বাবা—ছুটে তো এলি, কি আন্‌লি এ'র জন্যে?

নারায়ণী—বাবা, কি আর আছে আমার— ভালবাসা ছাড়া (প্রেমাশ্রু গড়িয়ে পড়লো বক্ষস্থলে। যদিও তিনি প্যারিস থেকে প্রচুর ভাল ভাল বিস্কুট, লজেন্স, পেন ইত্যাদি নিয়ে এসেছেন।)

বাবা---'জন্মান্তরের বন্ধনই তোকে এভাবে টেনে এনেছে। যতক্ষণ ঈশ্বরলাভ না হচ্ছে ততক্ষণ তোকে এইভাবে ঘুরতে হবে।'

কথায় কথায় নারায়ণী জানালেন---এখানে আসার সময় ত্রিবান্দ্রম থেকে কন্যাকুমারীর পথে একা (অতীব সুন্দরী বিদেশিনীকে) পেয়ে গাড়ীর চালক অন্য পথে নির্জন বনের মধ্যে নিয়ে চলে যান। বুঝতে পেরেই—'বাবা রক্ষা কর', 'বাবা রক্ষা কর' বলে চিৎকার করতেই ঐ নির্জন বনেই এক ভীল-জাতীয় লোকের আবির্ভাব হয় এবং তিনিই ঐ গাড়ী থামিয়ে তাকে শাসন করে অন্য গাড়ী ডেকে তাতে তুলে দেন। নারায়ণীর বিশ্বাস ঐ ভীল—শ্রীশ্রীবাবারই ছদ্মরূপ।

জনৈকা বিদেশিনী মায়ী বহুদিন বাবার কাছে আসতে না পেরে দুঃখ করে বাবাকে পত্র লিখেছিলেন। সেই পত্রের উত্তরে বাবা তাকে লিখলেন—

মাগো, তোর পত্র পাঠে আনন্দিত হলাম যে এ'কে পত্র লিখতেও আনন্দ পাচ্ছিস। তোরা আনন্দে ভরিত হয়ে থাক্। আনন্দই শ্রীভগবান। মাগো, আমরা কেউ স্বাধীন নই। শ্রীভগবান তোদের আনলেন না। তিনি মঙ্গলময়—অবশ্যই এর ভিতর মঙ্গল আছে, সে মঙ্গল হল প্রেমকে বর্দ্ধিত করা। দীর্ঘ অদর্শনে দিন-দিন প্রেম বাড়বে। মা, মিলন—প্রকৃত মিলন হয় বিরহে, কাজে কাজেই আমরা এখন মিলনেই আছি...।'

শ্রীশ্রীঠাকুরের এক বিশিষ্ট শিষ্যের কাছে 'ক্লডিয়া' নামে এক বিদেশিনীর পত্র—যিনি কিছুদিন পূর্বেই এক যুবকের সাথে বাবার কাছে এসেছিলেন,—'আমি এখন অরুণাচলে মহর্ষী রমণের আশ্রমে রয়েছি, ভারতে আসার ও ওঙ্কারনাথ বাবার সাহায্য পাওয়ার যে সুযোগ পেয়েছি তার গুরুত্ব অনুভব করছি। ওঙ্কারনাথবাবা সত্যই আকর্ষণীয় ও স্বতঃস্ফূর্ত্ত। তিনি আমাকে সাগ্রহে অভিনন্দন জানান; তিনি অত্যন্ত সহৃদয়, কোমলস্বভাব, গভীর ও সত্যনিষ্ঠ। কিন্তু আমার সঙ্গে একজন যুবককে দেখার পর থেকেই তিনি কিছুটা রহস্যময় ও কঠোর হয়ে যান। এবং আমার থেকে যেন দুরত্ব রক্ষা করে চলেন। অন্য পুরুষের সঙ্গে ঘোরার ঝুঁকি কি হয় তা যদিও আমি অনুভব করছি, কিন্তু ঐ ঘটনার পর থেকে শ্রীশ্রীবাবা যেন আমার প্রতি বিরূপ হয়েছেন বলে আমি অনুভব করি। আমি তাঁকে আর বিরক্ত করতে চাই না, ওঁর অসন্তোষ সৃষ্টি করতেও চাই না...আমি শুধু এইটুকুই ওঁকে জানাতে চাই যে আমি তাঁকে খুব ভালবেসে ফেলেছি। আমি তাঁকে আমার হৃদয়োৎসারিত আন্তরিক আদর জানাচ্ছি।

পত্রটি পড়ে শ্রীশ্রীবাবাও তাকে উত্তর দিলেন—

''মাগো, তুই মার করুণাধারায় স্নান করবি। তুই শুধু ভালবাসিস্ নি এ'ও তোকে ভালবেসে ফেলেছে। শ্রীশ্রীগুরুদেব স্বহস্তে লিখে গেছেন—'তুমি সত্যধর্ম প্রচার দ্বারা লোকোপকারে নিরত থাকো' এজন্য শাস্ত্রবিরুদ্ধ আচরণ দেখলে বলি মাত্র। এ'র পথ সকলকে গুরু বলে প্রণাম করা। শ্রীভগবান গুরুদেব সব সেজে লীলা করছেন—তাই মনে করে মনে মনে প্রণাম করি। 'I am with you' এইটি পড়লে বুঝতে পারবি।"

ফ্রান্সের সাহেব 'মোহনানন্দ' শ্রীশ্রীবাবার বহুদিনের আশ্রিত। অপূর্ব তার নামকীর্তন। যে কেউ তার মুখে নাম শোনে প্রশংসা না করে থাকতে পারে না। একবার হারমোনিয়াম ধরলে তার ৫।৭ ঘণ্টা কেটে যায় কিন্তু চোখে মুখে কোন ক্লান্তির ভাব দেখা যায় না। বাবা তাকে দেখলেই বলেন—'দ্যাখ্, ওর চোখেমুখে সর্বদা বৈকুণ্ঠের হাসি, ও এ জগতের লোক নয়।' রাত্রে নাম ধরেছে—ভোর হতে চললো। বাবা শৌচে যাবার জন্য বিছানা থেকে উঠেছেন—হঠাৎ নাম ছেড়ে দিয়ে সে পায়ের কাছে লুটিয়ে পড়লো, চোখ দিয়ে ঝর্ ঝর্ করে জল গড়িয়ে পড়ছে, ভাঙা ভাঙা গলায় বললো—'বাবা, ক্রমে ক্রমে ভক্তি চলে যাচ্ছে—কৃপা করুন। বাবা আনন্দের সঙ্গেই বললেন—

'ভক্তি নাহি বলি সংশয় যেন রে নাহি আসে তোর চিত্তে।
ডাকিতে ডাকিতে আসিবে ভক্তি পাবি যে অমূল্য বিত্তে।।
ভক্তির অপেক্ষা করে না কখনো, নামে প্রবল শক্তি।
অনিবার নাম নিলে পরে প্রিয় ছুটিয়া আসিবে ভক্তি।।'

অশ্রুসিক্ত মোহনানন্দ—মুক্তি কি করে হবে বাবা?

বাবা—(সহাস্যে) 'মুক্তি? মুক্তির জন্য চিন্তা কি? এক বড়া জাহাজ আয়গা, দুনিয়াকো যো কুছ্ সজ্জন আদমী হ্যায়, সবকো লে কর বৈকুণ্ঠ মে চলা জায়গা।'

জয়গুরু

শতবর্ষব্যাপী অখণ্ড হরিনাম সংকীর্তন মহাযজ্ঞপীঠ ও স্বামী সত্যানন্দতীর্থ মহারাজ

চিত্তরঞ্জন পাঁজা

শ্রীমৎ ১০০৮ স্বামীসত্যানন্দতীর্থ মহারাজ ১২৯৬ সালে বৈশাখ মাসে বাংলাদেশের ফরিদপুর জেলায় গোহালা গ্রামে জন্মগ্রহণ করেন। তাঁহার পিতার নাম ঁপরীক্ষিত চন্দ্র দে, মাতার নাম ঁকনকলতা দে। তিনি প্রথম জীবনে স্কুলমাষ্টার ছিলেন। খুলনা জেলায় সেনহাটি গ্রামে শ্রী রঘুনন্দন গোস্বামীর নিকট ধর্মশিক্ষা গ্রহণ করেন। তাঁর পিতামাতার মৃত্যুর পর ফরিদপুর জেলায় শ্রী রাধিকা মোহন গোস্বামীর নিকট দীক্ষা গ্রহণ করে সংসার ত্যাগ করিয়া ভারতবর্ষের সর্বতীর্থ পরিভ্রমণ করেন। তখন তাঁর বয়স ছিল ২৫।২৬ বৎসর, তীর্থ ভ্রমণের পর তিনি শ্রীশ্রীশঙ্কর হরিহর তীর্থের নিকট সন্ন্যাসধর্ম গ্রহণ করেন। এরপর হিমালয়ের পাদদেশে হৃষিকেশে একটি গুহায় দ্বাদশ বৎসর সাধন-ভজন করেন। সিদ্ধিলাভ করিয়া তিনি নাগপুরে যান। সেখানে যমুনাধর পোদ্দারের গৃহে কিছুদিন থেকে তাঁর জন্মভূমিতে ফিরে যান। সেইখানে শ্রী রঘুনন্দন গোস্বামীর সহিত সাক্ষাৎ করিলে তিনি তাঁহাকে শ্রীশ্রীহরিনাম প্রচারের জন্য অনুরোধ করেন। নামপ্রচার করতে করতে কলিকাতায় আসেন। পাইকপাড়ার রাজবাটিতে কুমার বাহাদুর শ্রী অরুণ চন্দ্র সিংহ মহাশয়ের সহিত সাক্ষাৎ করিয়া তাঁহার শ্রীনাম প্রচারের সঙ্কল্পের কথা বলেন। কুমার বাহাদুর স্বামীজীর প্রতি আকৃষ্ট হইয়া আশ্রম করিবার জন্য চিৎপুরের উপর নূতন বাজারের কাছে আশ্রম করিবার জন্য জমি দান করেন। স্বামীজী জমিটুকু পাইয়া শ্রীশ্রীরাধারাণী ও শ্রীশ্রীগোপীনাথের মূর্তি প্রতিষ্ঠা করিয়া ১০০ বৎসরের নাম সঙ্কল্প করিয়া অখণ্ড শ্রীশ্রীহরিনাম সংকীর্তন যজ্ঞ পরিচালিত করেন। ভক্তদের দ্বারা প্রথমে একটি টিনের মন্দির ও আটচালা স্থাপন করেন।

শ্রীমৎ ১০০৮ স্বামীসত্যানন্দ তীর্থমহারাজের উপদেশ—

১। পিতামাতাকে ভক্তি করিবে।

২। সর্বদা সত্য কথা বলিবে।

৩। অকৃতজ্ঞ মানব সবচেয়ে অধম।

৪। বিশ্বাসঘাত অপেক্ষা পাপী আর নাই।

৫। কূটনীতি হইতে ধর্মনীতিই শ্রেষ্ঠ।

৬। পরোপকারই শ্রেষ্ঠ পুণ্যকর্ম।

৭। সৎসঙ্গ সর্বাধিক উন্নতির লক্ষণ।

৮। মনের একাগ্রতাই শান্তি।

৯। ভক্তি ভিন্ন ভগবানের কৃপা লাভ হয় না।

১০। কৃষ্ণভক্ত কখনও বিনাশপ্রাপ্ত হয় না।

১১। অসৎ চিন্তা করিলে মানুষ সাধু হতে পারে না।

১২। নরক যাত্রার পথ রোধ করে একমাত্র হরিনাম।

১৩। মনপ্রাণ সব সময় শ্রীশ্রীরাধারাণী গোপীনাথের চরণে নিবেদন করতে হয়।

১৪। কলিযুগে শ্রীশ্রীতারকব্রহ্মনাম কীর্তনই পরিত্রাণের একমাত্র উপায়।

পরমানন্দ শ্রীশ্রীরাধাগোপীনাথের অশেষ করুণাধারায় শ্রীশ্রীসত্যানন্দ সাধন আশ্রম শতবর্ষব্যাপী অখণ্ড হরিনাম সংকীর্তন মহাযজ্ঞপীঠ প্রায় ৭৫ বৎসরে পড়িয়াছে। অনেক কষ্ট স্বীকার করিয়া স্বামীজী মানব কল্যাণের জন্য এই মন্দির প্রতিষ্ঠা করিয়াছিলেন। স্বামীজী চেয়েছিলেন এই ধর্ম সংস্থাপনের মাধ্যমে জনগণের মধ্যে প্রেমভক্তি গড়ে উঠুক। বহু জনগণ এই আশ্রম মন্দির নির্মাণ ও নামমণ্ডপ সংস্কারের জন্য আর্থিক সাহায্য ও সর্বপ্রকার সহযোগিতা করেছেন।

আমার মা এই আশ্রমের সঙ্গে অনেকদিন ওতপ্রোতভাবে যুক্ত ছিলেন। মা ভাবিতেন হরিনামতলা হল পুণ্যতীর্থক্ষেত্র। আধ্যাত্মিকতাই চিরশান্তির পথ। মা বলিতেন এক কৃষ্ণনামে সর্বপাপ নাশ হয়। হরিনাম তলাতে প্রতিদিন ভাগবতপাঠ হয়। এছাড়া রামায়ণ ও মহাভারত পাঠ হয় মাঝেমাঝে। বৎসরে দুবার খুব বড় উৎসব হয়, ঝুলন পূর্ণিমার আগে সাধুভাণ্ডার হয়। দূরদূরান্ত থেকে অনেক সাধুসন্ন্যাসী আসেন, তাঁদেরকে বস্ত্রদান ও ফল-মিষ্টি দেওয়া হয়, অনেকে প্রদীপ জ্বালিয়ে আরতি করে। সাধুদের অনেকরকম খাবার দিয়ে সেবা করান হয়, অনেক লোক আসেন সাধুদর্শন করতে। ঝুলন পূর্ণিমার দিন থেকে ১০দিন যাবৎ উৎসব চলে। এরপর আবার মাঘী পূর্ণিমার ১ মাস আগে থাকতে উৎসব আরম্ভ হয়। এই উৎসবেও দূরদূরান্ত থেকে কীর্তনীয়ার দল আসেন। এই উৎসবের সময় আশ্রমে পরম ভাগবত, প্রভুপাদ ও আচার্য্যগণ প্রতিদিন এখানে অমৃত সুধারস পরিবেশন করেন। উৎসব শেষ হয় মাঘীপূর্ণিমার দিন। ওইদিন এখানে ৬৪ মহন্তের ভোগ হয়। এই উৎসব দেখার মত, যে একবার দেখে সেই ভক্ত বারবার গোপীনাথের কাছে তাদের মনের কামনা জানাতে আসে। গোপীনাথ তাদের মনোস্কামনা পূরণ করে দেন। গোপীনাথ মন্দিরের আর একটা বৈশিষ্ট্য হল সন্ধ্যাআরতি ৪৫ মিনিট ধরে চলে। অনেক ভক্তগণই তাদের শান্তিলাভের জন্য এই আশ্রমে আসেন।

শ্রীশ্রীঠাকুরসীতারাম এই মন্দিরে বহুবার চরণ রেখেছেন গভীর রাত্রিতে। ঠাকুর সীতারাম আসতেন এই মন্দিরে রাত্রি ১২টার মধ্যে। শ্রীঠাকুর আশ্রমে এসে নামমণ্ডপ পরিক্রমা করতেন। শ্রীঠাকুর বলিতেন হরিনামতলাতে আসিলে মনপ্রাণ শান্ত হয়ে যায়। মন্দিরে শ্রীবিগ্রহ রাধারাণী ও গোপীনাথজীকে দর্শন মাত্রই মনের কালিমা দূর হয়ে যায় ও মন আনন্দে ভরে যায়। হরিনামতলা হলো জীবের সাধনার পরম আশ্রয়। এখানে আসিলে মনে সৎ ভাবনার উদয় হয়।

সর্বাধীশ বিঠ্ঠল রামানুজজী মহারাজ, সীতারাম মহাসিন্ধু-তীরে (দ্বিতীয় খণ্ড) বইটিতে স্বামী সত্যানন্দতীর্থ মহারাজের কথা লিখেছেন। একবার কুম্ভমেলায় হরিদ্বারে শ্রীঠাকুর সীতারাম আশ্রয় নিয়েছিলেন স্বামী সত্যানন্দ মহারাজের হরিদ্বারস্থিত পুণ্য আশ্রমপীঠে। এই স্থান হতে শ্রীশ্রীঠাকুর হরিদ্বার, হৃষীকেশ, লছমনঝোলা, স্বর্গদ্বার প্রভৃতি স্থানে শ্রীনাম প্রচার করেছিলেন। মহারাজজী লিখেছেন পুণ্যাত্মা সত্যানন্দতীর্থ মহারাজের পুণ্যাশ্রয়ে একমাস অবধি শ্রীশ্রীঠাকুর থাকেন। সীতারাম বাহিনীর শ্রীনাম সংকীর্তন ধ্বনিতে হরিদ্বারে আকাশ-বাতাস মুখরিত হয়ে ওঠে।

শ্রীশ্রীগোপীনাথ জিউর অপার কৃপায় এই লেখার সুযোগ লাভ করিয়াছি। শ্রীশ্রীরাধারাণী ও গোপীনাথের চরণে জানাই শতকোটি প্রণাম। আমাদের পরমপ্রিয় স্বামী সত্যানন্দতীর্থ মহারাজকে জানাই প্রণাম। আমার প্রাণের ঠাকুর সীতারামের চরণে শতকোটি প্রণাম।

— পথের আলোর গ্রাহকবৃন্দের প্রতি আবেদন —

দুঃখের সঙ্গে লক্ষ্য করা যাচ্ছে যে অনেকেই বেশ কিছু বৎসরের বাৎসরিক উপায়ন এখনও জমা দেননি। তাঁদের প্রতি বিশেষ আবেদন সত্বর বাৎসরিক উপায়ন পাঠিয়ে ঠাকুরের সেবায় ব্রতী হোন। মানি অর্ডার-এ উপায়ন পাঠাবার সময় 'পথের আলো' কথাটি এবং গ্রাহক সংখ্যা উল্লেখ করুন। প্রতিটি যোগাযোগের ক্ষেত্রে দয়া করে পিনকোড নং এবং টেলিফোন নং ব্যবহার করুন।

মহামিলন মঠে শ্রীশ্রীঠাকুরের লীলা প্রসঙ্গ

হি মা ং শু রা য়

(৪)

শ্রীশ্রীঠাকুর কথাটা শুনে কোনরকম প্রশ্ন জিজ্ঞাসা না করে শুধু বললেন, ''এ ১০৮ বার জপ করে।'' ঐ কথা শোনার পর ভক্তটির অন্তরের পরিবর্তন ঘটে। তাঁকে নিয়মিত উত্তর কলিকাতার পার্কের নামকীর্তনে যোগদান করতে দেখা গিয়েছিল। সকলে লাইন দিয়ে প্রণাম করছেন। শ্রীঠাকুরের নিয়ম অনুযায়ী বাবারা, মায়েরা আলাদাভাবে। এ দাসের পালা আসতেই নাম, গোত্র মনে মনে বলে প্রণাম করলাম, অন্তর্যামী ঠাকুরই সজোরে মাথায় চাপ দিয়ে আশীর্বাদ করলেন। ১২টার পর সকলের প্রণাম নিয়ে, সকলকে কৃপা বিতরণ করে উত্তরপাড়ার ভদ্রকালিতে রাত ২টার সময় ভোগ নিয়ে শয়ন করেন। ভোর ৫টায় বর্ধমানে নেমে বিভিন্ন স্থান হয়ে দিগসুইতে বিকাল ৪টায় ভোগ নেন। তারপর বালী প্রভৃতি বিভিন্ন স্থানে পদধূলি দান করে কলিকাতায় আগমন করেন। এমনই অপূর্ব তাঁর করুণালীলার প্রকাশ ঘটেছে যা স্মরণ করে লোকে বিস্মিত হয়ে ভাববে কারও পক্ষে এরকম অমানুষী লীলা সম্ভব কি করে হয়!

২৭শে কার্তিক, রবিবার—শ্রীশ্রীঠাকুরের প্রকাশিত ভ্রমণসূচী অনুযায়ী মহামিলন মঠে এলেন সকাল ১০টায়, বালীতে পদধূলি দিয়ে। আজকে মহামিলন মঠ বিশাল জনসমুদ্রে পূর্ণ। বিরাট এই মঠটি সাত বিঘা জমির উপর প্রতিষ্ঠিত। এই সুবৃহৎ পুণ্যবূমিও সে দিনের বিশাল সমাগমের তুলনায় অপ্রশস্ত মনে হয়েছিল। অন্ততঃ ২০,০০০ নরনারী নিঃসন্দেহে এসেছেন। অনেকে এসেছেন আবার কিছু সময় পরে চলে গেছেন। এদের সংখ্যা ধরলে ৫০,০০০ ছাড়িয়ে যাবে সম্ভবতঃ দর্শনার্থীর সংখ্যা। দীর্ঘ ২০ মাসের বিরহ ব্যাকুল এত জনসমাবেশ। অবশ্য এবারে শ্রীঠাকুর বাংলায় আগমন করে যেখানে যেখানে দর্শন দান করেছেন সেখানেই বিশাল জনসমাগমের যে আকুলতা ও উদ্দীপনা দেখা গিয়াছে তাহাতে বেশ বোঝা যায় এখন ভারতের বেশীরভাগ নরনারী ধর্ম মুখীনতার পরিচয় দিচ্ছেন। মহামিলন মঠের ভীড় যেন অভূতপূর্ব মনে হয়। ঐ বিরাট এলাকার ভীড় সীমানা অতিক্রম করে রাস্তায় নামিয়া যায়। বিস্তৃত প্রাঙ্গণে তিল ধারণের স্থান ছিল না। কলিকাতার বুকে বহুদিন পরে প্রকাশ্য দর্শন, তদুপরি ছুটির দিন থাকায় অত্যধিক জনসমাগম হয়। মঠে এসে শ্রীঠাকুর শ্রীমন্দিরে গিয়ে ১০ মিনিট কাল ফলভোগ ও বিশ্রাম করিয়া দর্শন মঞ্চে আরোহণ করেন। উপবেশনের পূর্বে শ্রীঠাকুর করজোড়ে উপস্থিত সহস্র সহস্র নরনারায়ণের উদ্দেশ্যে প্রণাম করেন। দর্শন দান, মাল্যগ্রহণ, প্রার্থনা, শ্রীশ্রীঠাকুরের ভাষণ ও পাঠ চলে প্রায় ২টা পর্যন্ত। শ্রীঠাকুর বিনয়ের অবতার তাই সকলকে হাতজোড় করে প্রণাম করে সাধুর কি আচরণ করা তার দৃষ্টান্ত রাখেন। সমাগত ১৫,০০০ এরও বেশী শিষ্যভক্তের সকলেরই চেষ্টা কিভাবে ঠাকুরের কাছে গিয়া মাল্যদান ও প্রণাম করা। শ্রীশ্রীঠাকুর সকলের মালা ও প্রণাম নিতে পারেননি। এতে বিশৃঙ্খলার সৃষ্টি হয়। ঠাকুর প্রায় ১ঘণ্টা ভাষণ দেন। মাইক ভাল না থাকায় সকলে ঠিক শুনিতে পান নাই। শ্রীঠাকুরের মঞ্চটি তৈরী হয়েছে গত রাত্রে। সামনে দুধারে বাঁশ দিয়ে ঘেরা সুন্দরভাবে। মধ্যে যাতায়াতের রাস্তা এবং দুধারে ঠাকুরের বাবারা, মায়েরা যাতে দুদিক দিয়ে ঠাকুরের কাছে পৌঁছে গিয়ে ভক্তিপূর্ণ অন্তরের অঞ্জলি নিবেদন করতে পারেন তার ব্যবস্থা ছিল। শ্রীঠাকুর প্রসন্নভাবে দুদিকেরই মালা গ্রহণ করতে থাকেন। সে দিন মঠে বড় মেলার মত অবস্থা হয়েছিল। বহু ফুল, মালা, ছবি, আসন, খাদ্যদ্রব্য বিক্রীর দোকান বসেছিল। জুতা রাখার ব্যবস্থাও

ছিল। অত্যধিক জনসমাগমে সব অনিয়মে পরিণত হয়। মালা নেওয়ার পর ঠাকুর আরম্ভ করেন প্রার্থনা করাতে। অপূর্ব সুন্দর ভঙ্গীতে এই প্রার্থনা মন্ত্রগুলি রচিত ও সংকলিত। প্রার্থনা মন্ত্র উচ্চারণের সঙ্গে সঙ্গে জনগণের মন শান্ত হয়ে যায়। তারপর শ্রীঠাকুর ভাষণ দান করেন। ভাষণ প্রদানকালে বহু অমৃতবাণী বিতরণ করেন। শ্রীঠাকুর বলেন, 'আমাকে গুরু মন্ত্র দেন নি। দিয়েছেন ভগবান। তোরা যা পেয়েছিস্ তা জপ কর্ এবং তাতেই কৃতার্থ হবি।" আরও অভয় বাণী দেন, ''নাম কর, নামে কৃতার্থ হবিই।'' আরও বহু অমৃতবাণীর বিতরণ করেন তাপিত, তৃষিত সন্তানদের প্রতি। তারপর ঠাকুর শ্রীমন্দির থেকে চলে গেলেন, তখন খুব বিশৃঙ্খলার সৃষ্টি হয়। বেলা ২টায় ঠাকুর চলে গেলেন, তারপর বহুলোক প্রসাদ পেলেন।

ঐদিন বিকালে বিদ্বৎ সংঘের পাক্ষিক সভায় শ্রীশ্রীঠাকুর কৃপা করিয়া উপস্থিত হইয়াছিলেন এবং আমাদের সনাতন ধর্মের আদর্শ যাহারা ক্ষুণ্ণ করিতেছেন বা করিয়াছেন, পত্রিকাগুলিতে তাহাদের বিরুদ্ধে বিনম্র প্রতিবাদ জানাইতে নির্দেশ দিয়েছেন। এইদিন মহামিলন মঠে ২ হাজারেরও বেশী দীক্ষার্থী সন্ধ্যা পর্যন্ত প্রতীক্ষা করেন। সন্ধ্যার সময় দীক্ষা শুরু হয় ও শেষ হয় রাত ৯টায়। এই ভীড়ের মধ্যে কিছু দুষ্ট প্রকৃতির ছেলে অনেক মায়েদের মূল্যবান হার ও জিনিস হাতিয়েছিল। পুলিশের লোকেরাও ভীড় নিয়ন্ত্রণ করতে সমর্থ হন নাই, পরে আরও এক গাড়ী পুলিশ আসিলে কিছু শৃঙ্খলা ফিরিয়া আসে। বিরাট চাপাচাপিতে কেউ কেউ কেঁদে ফেলেন, অনেকে অভিযোগও করেন। ৫-৬জন জ্ঞান হারাইয়া ফেলেন। এই বিশাল জনসমাগম প্রসঙ্গে বরেণ্য সাহিত্যিক পুরঞ্জয় রায় লিখেছেন 'দেবযান' পত্রিকায় একটি প্রবন্ধে,' মহামিলনের ভীড় যারা স্বচক্ষে না দেখেছেন তাদের বর্ণনা দিয়ে বোঝানো সম্ভব নয়। সেই বিশাল জনারণ্যে আমরাই প্রায় হারিয়ে গিয়েছিলাম, অপরের কথা কি বলবো! দর্শনার্থীদের মধ্যে দার্শনিক পণ্ডিতদল থেকে ধনী নির্ধন নির্বিশেষে সকল স্তরের মানুষ এসে জড় হয়েছিলেন মঠের ভিতরে বাইরে সর্বত্র। এই সকল ভীড়ে দেখলুম ভাগবতী-তনুর উপর সে কী কঠিন নির্মম নিষ্পেষণ! কৃপাপাত্রদের কৃপা বিতরণ করতে এমন অকৃপণ উদার প্রসন্ন অধ্যায় স্বচক্ষে দেখলেও যেন অবিশ্বাস্য মনে হয়। এরই মধ্যে ছিলেন প্রায় ২০০০ মত দীক্ষার্থী। এক পরমাশ্চর্য্য অবিস্মরণীয় ভাবস্রোত! সমগ্র বিশাল জনতার শ্রদ্ধা, বিশ্বাস, ভালবাসা ও আকুতি নিয়ে দাঁড়িয়ে এক সচল বিগ্রহ! সকলেই ভাবছে—একবার শুধু একবার দর্শনেই বুঝি দূর হয়ে যাবে সকল দূরিত, সকল দুর্যোগ! শ্রীঠাকুর রাত্রিতে 'শাস্ত্র ভগবান প্রেস' ভবনেই ছিলেন। রাত্রি ২টা থেকে ৩টা যারা ছিলেন তাদের স্পর্শ প্রণাম গ্রহণ করেন। পরদিবস সকালে মঠ থেকে বেরিয়ে কয়েক স্থানে কৃপা করে মহামিলন মঠে ফলভোগ গ্রহণ করে মোমিনপুরে চলে যান।

৩০শে কার্তিক—ঠাকুর পাঞ্জাব মেলে কাশী যাত্রা করেন। মহামিলন মঠে ১৫ই কার্তিক, ১৩৭৮ শ্রীশ্রীরাসপূর্ণিমায় প্রকাশিত একটি প্রচারপত্র বিতরিত হয়—'সচ্চরিত্র' শিরোনামায় শ্রীঠাকুরের লিখিত সচ্চরিত্রগণের প্রতি উপদেশ, 'নারী হতে দূরে থাকবে।' প্রভৃতি। ২ সপ্তাহ অমৃতবাণী বিতরণ করেন দ্রুতগতিতে তারপর চোখ দেখাতে আবার এলেন ১৫ই অগ্রহায়। শ্রীঠাকুর একটি পত্রে একজনকে লিখলেন, ''কক্ষচ্যুতঃ গ্রহের মত উত্তরকাশী থেকে বাংলায় এসেছিলাম আবার তথায় গিয়ে চোখ কাটানোর জন্য পুনরায় এসে পড়েছি।' চক্ষু অপারেশনের পর প্রথম প্রকাশ্য দর্শন পাওয়া গেল ৭ই ফাল্গুন, রবিবার। মহামিলন মঠে শ্রীসত্যধর্ম প্রচার সংঘের ষোড়শ বার্ষিক সাধারণ সম্মেলন উপলক্ষ্যে। সে দিনের সভায় পরলোকগত বহু জ্ঞানী, গুণীজনেরা সভা অলঙ্কৃত করেছিলেন। তন্মধ্যে সত্যধর্ম প্রচার সংঘের অন্যতম প্রাণপুরুষ, তৎকালীন কোষাধীশ ডাঃ রামগোপাল বন্দ্যোপাধ্যায়, শ্রীগোপীনাথ ভট্টাচার্য্য (সম্পাদক, পথের আলো, কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের সংস্কৃত ভাষার প্রাক্তন অধ্যক্ষ), পুরঞ্জয় রায় বন্দ্যোপাধ্যায় (প্রথম সঞ্চালক, সত্যধর্ম প্রচার সংঘ, দেবযান পত্রিকার সঞ্চালক, সুলেখক, সুবাগ্মী,

সুমধুর ব্যবহারকারী শ্রীঠাকুরের প্রাচীন সেবক), ডঃ তারাশঙ্কর ভট্টাচার্য্য (অধ্যাপক দর্শন বিভাগ, কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়, অধ্যক্ষ সংস্কৃত কলেজ), বেলুনের লক্ষ্মী বন্দ্যোপাধ্যায়, সর্বাধীশ তারকনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় প্রভৃতি ভাষণ দেন। শ্রীঠাকুর অসুস্থ থাকায় ভাষণ দেন নি। ২ ঘণ্টা মত সবার কাজ হল। শ্রীঠাকুরের সঙ্গে কিঙ্কর সেবানন্দ, কিঙ্কর ওমানন্দ ও সুব্রত দা ছিলেন।

১৮ই ফাল্গুন পুরী থেকে বাংলায় ফিরে ২২শে ফাল্গুন প্রকাশ্য দর্শন দান করলেন মহামিলন মঠে প্রচার সূচী অনুযায়ী। ২০০০ লোক প্রসাদ পেলেন। ভোগের পর ঠাকুর বেদ বিদ্যালয়ে চলে যান। ২৯শে ফাল্গুন তুফান এক্সপ্রেসে শ্রীঠাকুর দিল্লী গমন করেন।

১৩৭৯ বঙ্গাব্দ

এবার এলেন হঠাৎই। ঁনীহার চট্টোপাধ্যয় ভাগীরথী মঠে ঠাকুরসঙ্গ করে বিদায় গ্রহণকালে বাংলায় পদার্পণের প্রার্থনা জানাতেই ঠাকুর কৃপা করে এলেন। উপলক্ষ—পরমগুরুমায়ের জন্মোৎসবে যোগ দেওয়া। ৪ঠা ভাদ্র মধ্যরাত্রে প্লেনে এলেন কোলকাতায়। ৫ই ভাদ্র দুপুর ১টায় এসে ১ ঘণ্টা অবস্থান করেন। নির্মীয়মান মন্দির ও বিরাট প্রাচীর প্রভৃতি পরিদর্শন করিয়া শ্রীমন্দির ও শাস্ত্র ভগবান প্রেস এবং বিদ্যাপীঠ ঘুরিয়া ২টার পর দিগসুই যাত্রা করেন। ২৬শে ভাদ্র মধ্যাহ্নে একবার মহামিলন মঠে এসে নীহার চট্টোপাধ্যায়ের বাড়ী চলে যান। ২৭শে ভাদ্র কলিকাতার কয়েকটি স্থানে কৃপা করে মধ্যাহ্নে মহামিলন মঠে গমন করিয়া নামমঞ্চ প্রদক্ষিণ করত বেলা ৩টায় মনোহরপুকুরে গমন করেন। ১লা আশ্বিন বেলা সাড়ে এগারটায় একবার মঠে ঠাকুর আসেন। ২রা আশ্বিন বিকালে একবার মঠে ঠাকুর আসেন।

৫ই আশ্বিন শ্রীঠাকুর তারিঘাট যাত্রা করেন। আবার এলেন বাংলায় ১২ই অগ্রহায়ণ পৌত্র জগন্নাথের বিবাহ উপলক্ষে।

২৩শে অগ্রহায়ণ বিকাল ৪টায় শ্রীঠাকুর মহামিলন মঠে এলেন। বহু স্থানে পদধূলি দান করে ক্লান্ত শরীরে গাড়ীতে ঘুমিয়ে আছেন দেখলাম। মধ্যাহ্ন থেকে অগণিত ভক্তবৃন্দ আকুল প্রতীক্ষায় অপেক্ষা করছিলেন। হঠাৎ আসায় তারা শ্রীঠাকুরকে ঘিরে ধরেন। কোনক্রমে ঠাকুরকে নিয়ে যাওয়া হয় ভোগের ঘরে। তখন প্রায় সাড়ে বারটা বাজে।

২রা পৌষ বেলা ২টা শ্রীমন্দিরের দালানে অল্প সময়ের জন্য দীক্ষার্থীদের দর্শন দিয়া বিশ্রামে গেলেন। সন্ধ্যার পর কিছু দীক্ষার্থীদের দর্শন দিয়া ও প্রণাম নিয়া অপেক্ষমান জনতাকে দর্শন দিতে শ্রীমন্দিরের বেড়ার ধারে মঞ্চের উপর উপবেশন করিলে সকলে গুরু মহারাজের জয়ধ্বনি করেন। শ্রীঠাকুর প্রথমে তাঁর ক্ষীণ কণ্ঠে 'প্রার্থনা' করাইলেন। তারপর সকলকে পাঁচ মিনিট মৌন থাকিতে নির্দেশ দেন। তারপর একটি নাতিদীর্ঘ ভাষণ দান করেন। তার কিছু অংশ—শ্রীঠাকুর বলেন ধর্ম প্রসঙ্গে। ধর্মের লক্ষণ কি? এ ধর্মের আচরণ সকলের। অহিংসা, সত্য, অস্তেয়, শৌচ, ইন্দ্রিয় নিগ্রহ। অহিংসা—কাহারও হিংসা না করা। সত্য—মনে ও মুখে এক হওয়া। অস্তেয়—চুরি না করা। শৌচ—বাহ্য শৌচ ও অন্তর শৌচ। বাহ্য শৌচ জল মাটির দ্বারা। আর ইন্দ্রিয় দমনের পথ আন্তর শৌচ। মৈত্রী—সমানে সমানে বন্ধুভাব। করুণা—তোমা অপেক্ষা নিম্নের প্রতি দয়া দেখাইবে। মুদিতা—তোমাপেক্ষা উচ্চের সৌভাগ্যে তাহার প্রতি ভগবানের কৃপা অনুভব করিবে। উপেক্ষা—পাপীকে উপেক্ষা করিবে। শৌচ সম্বন্ধে ঠাকুর বলেন—এ পাঞ্চভৌতিক দেহজ স্থূল। স্থূলে দেহের বাহ্য শৌচ প্রয়োজন। অশুচি থাকিলে তাহার ধর্মে কর্মে অধিকার হয় না। বাবারা, মায়েরা অশুচি অবস্থায় আছে। মায়েরা যে বেশভূষা ব্যবহার করে ও ১৪।১৫ বৎসর মেয়েদের ফ্রক পরিয়ে রাখে তাতে তাদের শালীনতা বোধ নাই। এই বেশভূষা পরপুরুষকে আকর্ষণ করে। নিজেরাও মরে, মেয়েদেরও সেই পথে এগিয়ে দিচ্ছে।

ক্রমশঃ

মর্তেষু অমৃতম্
(শ্রীশ্রীঠাকুরের সাধনলীলা)
মৃ ণা ল কা ন্তি ভ ট্টা চা র্য্য
(পূর্ব প্রকাশিতের পর)

পূজাপাঠ সেরে ভাবতে লাগলেন—কেন আবার ধরায় নামতে হল? মা এটাকে নিয়ে আবার কি করতে চান? ভাবতে ভাবতে সারাদিন কেটে গেল এক ঘোরের মধ্যে। রাত্রে গুরুদেব ফিরে এলে পদসেবা করতে করতে পূজার আসনে যা যা ঘটেছে আনুপূর্বিক সব বর্ণনা করলেন। শেষে জিজ্ঞাসা করলেন—'এ সব কেন হচ্ছে? সত্যিই কি পাগল হয়ে গেলাম? যদি মাথা খারাপ হয়, তবে চিকিৎসা করান।'

কহিলেন দৃঢ়স্বরে দেব যোগেশ্বর।
হয়নি খারাপ মাথা সাধক প্রবর।।
চালাও সাধনা তুমি নাহিক সংশয়।
অভীষ্ট পূরিবে শীঘ্র কহিনু নিশ্চয়।।

সেই বছর ফাল্গুনি পূর্ণিমায় ডুমুরদহে ব্রজনাথজীর দোলোৎসবে সবাই আনন্দ করছে। মেতে উঠেছে রঙের খেলায়। এদিকে সীতারাম কিন্তু এক ভাবনায় বিভোর হয়ে আছেন। তাঁর মনের খাতায় বারবার লিপিবদ্ধ হচ্ছে একই জিজ্ঞাসা—পুনরায় কেন ধরায় নামতে হল? মা এটাকে নিয়ে কি করতে চান? প্রারব্ধ ক্ষয়, না অন্য কোন অভিপ্রায়? কোন উত্তর খুঁজে পাচ্ছেন না। চিন্তা ক্রমে গভীরতর থেকে গভীরতম হল। সীতারাম অস্থির হয়ে উঠলেন। সহসা বিদ্যুৎ খেলে গেল মনের গহনে। খুলে গেল হৃদয়দ্বার। সমস্ত সত্ত্বাজুড়ে হল চৈতন্যোদয়। সেই চৈতন্যালোকে সুস্পষ্ট দেখলেন তিনি কে? আর তখনই তাঁর হৃদয়সাগর মন্থন করে অন্তরের অন্তঃস্থল থেকে বার বার ধ্বনিত হতে লাগল সেই শাশ্বত বাণী-

''যদা যদা হি ধর্ম্মস্য গ্লানির্ভবতি ভারত।
অভ্যুত্থানমধর্ম্মস্য তদাত্মানং সৃজাম্যহম্।।'' (গীতা ৪।৭)

সীতারাম স্পষ্ট শুনলেন শ্রীমুখ নিঃসৃত সেই বাণী। শোনার সাথে সাথে তাঁর স্বরূপ প্রকাশিত হল। জগৎ কল্যাণকল্পে পরব্রহ্ম সীতারাম বিগ্রহরূপে ধরাধামে অবতীর্ণ হয়েছেন।

ধর্মহানি পাপবৃদ্ধি যখন যখন।
আবির্ভূত হই আমি ধরায় তখন।।
সাধুদের পরিত্রাণ পাপের বিনাশ।
ধর্মধন সংস্থাপনে আমার প্রকাশ।।

আবির্ভাবের কারণ অবগত হয়ে সীতারাম ভাবের সাগরে ভাসতে লাগলেন। আপনার ভাবে আপনি বিভোর হয়ে গেলেন। তাঁর অন্তর তোলপাড় হতে লাগল। যেন কুঁড়ের মধ্যে হাতি প্রবেশ করেছে। সিন্ধু যেন মিশেছে এসে বিন্দুর ভিতর।

সাধনার শেষ প্রান্তে দাঁড়াইয়া প্রভু।
অনুভব করিলেন তিনি সেই বিভু।।
সর্বশক্তি অধীশ্বর দয়াল ঠাকুর।
নরদেহে লীলা তার বিচিত্র মধুর।।

ইপ্সিত প্রদর্শন ঃ

পরদিন সীতারাম দিগসুই চলে গেলেন। গুরুদেব অবাক হয়ে তাকিয়ে রইলেন শিষ্যের মুখের দিকে। উজ্জ্বল দ্যুতিতে সীতারামের মুখমণ্ডল উদ্ভাসিত। এক অপার্থিব আনন্দ বিরাজ করছে তাঁর চোখেমুখে। আর তাতে যেন যুগপৎ বহু প্রশ্ন-উত্তরের সমাবেশ। গুরুদেব জিজ্ঞাসু দৃষ্টিতে জিজ্ঞেস করলেন—কিম্? কি ব্যাপার? শিষ্য ইঙ্গিত করলেন ঘরে আসতে। ঘরে ঢুকলেন চারজন—সীতারাম, গুরুদেব, গুরুপত্নী আর মা কমলা। কমলা মা তখন দিগসুয়ে ছিলেন। গুরুদেব, গুরুপত্নী এবং কমলা মা দেখলেন তাঁদের সামনে যেন স্বয়ং ব্রহ্ম দাঁড়িয়ে। গুরুদেব প্রশ্ন করতে গিয়ে চুপ হয়ে গেলেন। সহসা শুরু হল কম্পন। সবার শরীর দুলছে। অব্যক্ত

তার আনন্দ। অনির্বচনীয় তার অনুভূতি। একটা ভাবের ব্যঞ্জনা। অপূর্ব তার মূর্চ্ছনা। শিরা উপশিরায় বয়ে চলেছে শিহরণ। সহসা সীতারামের দক্ষিণ হস্ত উত্তোলিত হল। আর তার অঙ্গুলির ইঙ্গিতে ঊর্দ্ধলোকে হল এক অপূর্ব দর্শন।

উজ্জ্বল জ্যোতির মধ্যে যুগল কিশোর।
দেখিতে লাগিল সবে হইয়া বিভোর।।
অনাস্বাদিত আনন্দে ভরে গেল মন।
মহাভাবে কেটে গেল বেশ কিছুক্ষণ।।

গুরুদেব অভিভূত হয়ে গেলেন। এত সহজে ইষ্ট দর্শন কী ভাবে সম্ভব? যুগ যুগ তপস্যা করে যোগী ঋষিগণ যে ধন লাভ করতে পারে না। সীতারাম অনায়াসে তা কেমন করে দেখাল? গুরুদেব বিহ্বল হয়ে পড়লেন। ঘোর কাটতে তিন-চার দিন লাগল। স্বাভাবিক হয়ে ভাবতে লাগলেন প্রবোধ কি কোন যাদুটাদু জানে? আবার ভাবলেন তা কেমন করে হবে?

শ্রদ্ধা ভক্তি যার চিত্তে সদা উপজয়।
সে করিবে ছলাকলা কেমনে তা হয়।।

সীতারাম তাঁকে যা দর্শন করালেন, তা তাঁকে গভীরভাবে ভাবিয়ে তুললো। যতই বিচার করেন ততই বিষণ্ণ হয়ে পড়েন। ভাবলেন—এ তার সাধনার সিদ্ধ ফল নয়। তাই এর স্থায়িত্ব সাময়িক। নানান সাত-সতের ভেবে গুরু ক্ষুব্ধ হলেন। বললেন—'তুমি আমাদের যাদু করেছ। ভেলকী দেখিয়েছ।'

সীতারাম বিনয়ের সাথে বললেন, যে মন্ত্র দিয়াছেন, সেই মন্ত্র জপ ছাড়া আর কিছুই জানি না। কেমন করে যাদু করলাম? গুরুদেবের সন্দেহ যায় না। তাঁর মন্ত্রের এত শক্তি যে বিশ্বাসও হয় না। এ যেন একই ঘটনার পুনরাবৃত্তি। শ্রীরামকৃষ্ণ অবতারে যখন গদাধর দক্ষিণেশ্বরের কালী মন্দিরের পূজারী নিযুক্ত হলেন তখন তাঁকে শক্তি মন্ত্রে দীক্ষা দিলেন কলকাতার বৈঠকখানার বিখ্যাত তান্ত্রিক কেনারাম ভট্টাচার্য্য মহাশয়। গদাধরের কানে যেই মন্ত্র পড়ল অমনি অতলায়িত হলেন। ডুবে গেলেন গভীর সমাধিতে। গদাধর তখন অন্য জগতের মানুষ। গুরু তো অবাক! তাঁর নিজের মন্ত্রের এত শক্তি তা তাঁর নিজেরই অজানা। এখানেও তদ্রূপ, যোগেশ্বরদেব বিশ্বাস করতে পারছেন না যে—তাঁর দেওয়া মন্ত্র বলে প্রবোধ এমন অসাধ্য সাধন করতে পারে? সন্দেহের আতিশয্যে আরও কিছু দেখতে চাইলেন।

গুরু আজ্ঞা মহা আজ্ঞা ধরিয়া শিরেতে।
দেখাইল গুরু যাহা চাহিল দেখিতে।।
যে রূপ দেখায়েছিল কুরুক্ষেত্র রণে।
দেখাইল সেইরূপ গুরু সন্নিধানে।।

গুরুদেব বিস্ময় বিহ্বল চিত্তে ভাবতে লাগলেন কে এই শিষ্য? কথায় কথায় যে অভীষ্ট পূরণ করে। ঈপ্সিত দর্শন করায়। এ মানব? না অন্য কেউ? এর স্বরূপ কী? বিস্ময়ের ঘোরে তিনি লিখলেন অপূর্ব ভাবের একটি ছোট্ট পত্র।

গুরু কিংবা শিষ্য তুমি নাহি জানিলাম।
জানি শুধু আমি তব মোর সীতারাম।।
তুমি যদি গুরু তবে লইনু শরণ।
কৃপা করে পরিত্রাণ কর নারায়ণ।।
আর যদি শিষ্য হও কহ গো আমার।
কি উপাদানে গঠিত স্বরূপ তোমার।।

গুরু মেলে লাখ লাখ শিষ্য মেলে এক। উপযুক্ত শিষ্য ঠিক ঠিক গুরুমন্ত্র সাধন বলে সাধনার চরম সিদ্ধি ঋদ্ধি লাভ সমর্থ হয়। তখন কে বা গুরু কে বা শিষ্য নির্ণয় করা কঠিন হয়ে পড়ে। দক্ষিণেশ্বরে ব্রাহ্মণী ভৈরবী এক এক করে চৌষট্টি প্রকার তন্ত্র সাধনা করালেন শ্রীরামকৃষ্ণকে দিয়ে। শেষে শ্রীরামকৃষ্ণ যখন তন্ত্রের চরম পর্যায়ে পৌঁছালেন তখন ব্রাহ্মণী তো অবাক! যেখানে তিনি নিজেই পৌঁছাতে পারেন নি, সেখানে শিষ্য শ্রীরামকৃষ্ণ অনায়াসে পৌঁছে গেছেন। ব্রাহ্মণী তখন শ্রীরামকৃষ্ণের কাছে শিষ্যত্ব যাচ্ঞা করলেন। বললেন—'বাবা, বীরভাবে সাধনা করে আমি সিদ্ধি পেয়েছি। কিন্তু তুমি দিব্যভাবের অধিকারী। তোমার মাঝে যে বিশুদ্ধি, যে সচ্ছতা যে শান্তি বিরাজ করছে, আমার তা অনধিগম্য। আমার মনে হয় আমি অপূর্ণ, অশক্ত। তুমি জ্যোতির্ময়, আনন্দময়, সর্বশক্তিমান, সর্বময়। আমি চাই

ঐ ব্যাপ্তি, ঐ আনন্দ, ঐ দিব্যচেতনা। আমি তোমার শিষ্যা হব। আমায় দীক্ষা দাও।' সম্পূর্ণ আত্মসমর্পণ করলেন ভৈরবী। শ্রীরামকৃষ্ণ বললেন—'সে কি গো, তুমি যোগেশ্বরী। যোগামায়ার অংশ। তুমিই তো সব শেখালে। তুমি আমার গুরু।'

যখন পূর্ণজ্ঞান হয় তখন গুরুশিষ্যে ভেদাভেদ থাকে না। নিজেই গুরু নিজেই শিষ্য। সেখানে গুরুও নেই শিষ্যও নেই। সে বড় কঠিন ঠাঁই গুরুশিষ্যে দেখা নাই। শুকদেব গোস্বামী যখন ব্রহ্মজ্ঞানের জন্য জনক রাজার কাছে গিয়েছিলেন, জনক রাজা বলেছিলেন—'আগে দক্ষিণা দাও।' শুকদেব বলেছিলেন—'আগে বস্তুলাভ না হলে কি করে দক্ষিণা হয়?? জনক রাজা হেসে বলেছিলেন—'ব্রহ্মজ্ঞান পেলে কি আর গুরুশিষ্য বোধ থাকবে? তখন কে বা গুরু কে বা শিষ্য আর কিবা দক্ষিণা? তাই বলি বাপু দক্ষিণাটি আগে দাও।'

এখানেও তাই। শিষ্য এখন পূর্ণজ্ঞানী সচ্চিদানন্দ। জগৎগুরু। শিষ্যের স্বরূপ জেনে যোগেশ্বরদেব বাড়ীতে বলে দিলেন—'প্রবোধকে আর উচ্ছিষ্টান্ন খেতে দেবে না। কোন কাজের ফরমাস করবে না। প্রবোধ যে সে নয়, নররূপে নারায়ণ।'

সেই নারায়ণ গুরুদেবের পদসেবা করলেন। তাহলে গুরুদেব কোনজন? তিনিই বা কম কি সে? এ বিচার বড়ই কঠিন। গুরু-শিষ্যের পরিচয় বড় রহস্যময়। ব্যবহারিক জগতে দাশরথিদেব হলেন প্রবোধের দাদা। যেহেতু তাঁরা সতীর্থ ছিলেন। তাই শিষ্য গুরুদেবকে দাদা বলেন আর গুরুমাকে বৌদি বলেন। এ সম্পর্ক গড়ে উঠেছিল শ্রদ্ধা ও স্নেহের বিনিময়ে। গুরুশিষ্য একই ভাবের ভাবুক। একই পথের পথিক। দেহের সাদৃশ্যও প্রায় একই। যেন দুইভাই। আর আধ্যাত্মিক দিক দিয়ে একে অপরের ধাতা-পাতা-পরিত্রাতা অর্থাৎ জীবন সর্বস্ব।

সীতারাম যদি নারায়ণ তবে তাঁর সাধনার কী প্রয়োজন? শাস্ত্রের মর্যাদা রক্ষার জন্য শ্রীশ্রীঠাকুরের যত সাধনা। সাধনা ব্যতীত সিদ্ধিলাভ হয় না। সেই শাস্ত্রাচার দেখাবার জন্য তাঁর সাধন সমরে নামতে হয়েছে। গুরুকরণ করতে হয়েছে। শিষ্যত্ব গ্রহণ করতে হয়েছে। তিনি জন্ম সিদ্ধ। তাই দেখা যায় তাঁর আগে সিদ্ধি পরে সাধনা। ঠিক লাউ কুমড়োর মত—আগে ফল পরে ফুল। এসবই লোকশিক্ষার জন্য তাঁর নিখুঁত অভিনয়।

লোকশিক্ষা তরে তাঁর যতেক সাধন।
অবহেলে প্রভুদের করিল পালন।।
জন্ম সিদ্ধ প্রভু মোর শাস্ত্র রক্ষিবারে।
শাস্ত্রের বিগ্রহরূপে আসা ধরাপরে।।

কেবলমাত্র গুরুদেব, গুরুপত্নী এবং সহধর্মিণীকে ঈশ্বর দর্শন করিয়ে ক্ষান্ত হলেন না। জনে জনে ডেকে ডেকে সেধে যেচে বলতে লাগলেন—'কে ঈশ্বর দেখবি আয়।' মূঢ়মতি মানব এমন তমাশ্রিত যে শ্রীপ্রভুকে চিনতে পারল না। পাগল বলে গালিগালাজ করতে লাগল। দু'চারজন যাঁরা অতি ভাগ্যবান শ্রীপ্রভুর সান্নিধ্যে এলেন তাঁদের মহাদর্শন হয়ে গেল। কারও হাত ধরে, কারও বা ঘাড় ধরে যার যা অভিলাষ তাই দেখালেন। তাঁদের জীবন ধন্য হয়ে গেল।

কাহারও ধরিয়া হাত কাহারও বা ঘাড়।
দেখাইয়া দেন যাহা ইচ্ছা দেখিবার।।
শ্রীহস্তের স্পর্শে মাত্র হয়েছে দর্শন।
যুগ যুগ ধ্যানে মুনি না পায় সে ধন।।

ভগবান যখন নররূপে ধরায় আসেন তখন সহজে তাঁকে চেনা যায় না। তিনি কৃপা করে যাঁকে চেনান সেই তাঁকে চিনতে পারেন। অজ্ঞ মানবের সাধ্য নেই যে তাঁকে চেনে। ত্রেতা যুগে সবাই জানত যে শ্রীরামচন্দ্র অযোধ্যার রাজা দশরথের পুত্র। মাত্র বারোজন ঋষি কিন্তু জানতেন যে শ্রীরামচন্দ্র পূর্ণব্রহ্ম নারায়ণ। তাই শ্রীরামচন্দ্র যখন বনে গেলেন ঋষিগণ তাঁকে চিনতে পেরে পাদ্য-অর্ঘ্য দিয়ে পূজা করলেন।

'ভরদ্বাজ কহিলেন তুমি নারায়ণ।
তপস্বীর বেশে কেন বনে আগমন।।
পূর্ণব্রহ্ম সনাতন পুরুষ প্রধান।
অবতীর্ণ ধরাধামে সীতাপতি রাম।।'

দ্বাপর যুগেও ভগবান শ্রীকৃষ্ণের আবির্ভাবের সময় কংস কারাগারে অসংখ্য প্রহরীর মধ্যে মাত্র দু'চারজন চুপি চুপি রাত্রি জেগেছিলেন। অর্থাৎ মা

মহামায়া তাঁদের জাগিয়ে রেখেছিলেন। কারণ তাঁরা ভক্তিবলে জেনেছিলেন যে ভগবান আবির্ভূত হবেন। তাই কৃষ্ণ সন্দর্শনের আশায় তাঁরা কাউকে কিছু না বলে দ্বারে জেগেছিলেন। বসুদেব যখন শ্রীকৃষ্ণকে নিয়ে কারার বাহিরে এলেন তখন তাঁরা প্রাণ ভরে কৃষ্ণদর্শন করলেন।

সেই মত ভাগ্যবান দুই চারজন।
পাইয়াছে শ্রীপ্রভুর কৃপা মহাধন।।
অতি পুণ্যবলে তারা দেখিবারে পায়।
কোনরূপে বিরাজিছে সীতারাম রায়।।
সহজে তাদের প্রভু দিয়াছেন ধরা।
সাধন-ভজন নাই নাই জপ করা।।

যোগ সাধনা ঃ

সীতারাম তখন নিজ মহিমায় মুগ্ধ। তাঁর মধ্যে যে অসীম শক্তির এবং অনন্ত রূপের সমাবেশ হয়েছে তা তাঁকে উদ্‌ভ্রান্ত করে তুলল। গুরুদেব দেখলেন—সীতারাম সতত অস্থির চিত্ত। স্থির হতে পারছে না। শিষ্যের অবস্থা দেখে তাকে যোগ সাধনা করার যুক্তি দিলেন। বললেন—

পারিলে না হতে স্থির তুমি সীতারাম।
যোগাভ্যাস কর তুমি লভিবে আরাম।।

আরও বললেন—ত্রিবেণীর আশ্রমে মহাযোগী গৌড়েন্দ্রজী থাকেন। তাঁর বয়স আড়াইশো বছর। তাঁর কাছে গিয়ে তোমার সব কথা বল। তিনি তোমার সমস্যার সমাধান করে দেবেন।

গুরুদেবের নির্দেশ মত সীতারাম গৌড়েন্দ্রজীর কাছে গেলেন। সশ্রদ্ধ প্রণাম জানিয়ে বললেন তাঁর মনের অভিপ্রায়। যোগীরাজ প্রশ্ন করলেন—'সংসার আছে?'

'আজ্ঞে হ্যাঁ।' বিনীতভাবে উত্তর দিলেন সীতারাম।

'সংসারে কে কে আছে?'

'মা-স্ত্রী-পুত্র-কন্যা-আত্মীয়স্বজন।'

'তাদের খাওয়াবার কেউ আছে?'

'না।'

'তবে তো হবে না। আমি উপদেশ করলে চিত্তবৃত্তি নিরোধ হয়ে যাবে। তাদের খাওয়াবে কে? আচ্ছা এক কাজ কর—'জলমে সমাধি করো।' জলে সমাধি করলে মন স্থির হবে। তারপর মন যে দিকে লাগাবে সেই দিকেই লেগে যাবে।'

যোগীরাজের আদেশে সীতারাম জল দেখতে লাগলেন। জলে মন স্থির করতে গিয়ে ভিতরে নাদের আবির্ভাব হল। যোগীবরকে নিবেদন করলেন—সে কথা। শুনে গৌড়েন্দ্রজীর খুব আনন্দ হল। জিজ্ঞেস করলেন—'কোন শরীর?'

'ব্রাহ্মণ শরীর।'

'তবে তো সমাধি লাগে গা।'

নির্বিকল্প সমাধির যতেক লক্ষণ।
শ্রীঅঙ্গে সুস্পষ্ট যোগী করে নীরিক্ষণ।।

একদিন সীতারামকে সিদ্ধাসনে বসিয়ে ভ্রূর মধ্যে ধ্যান করতে বললেন। ধ্যানে বসে সীতারাম হরিনামে আত্মহারা হয়ে গেলেন। ধ্যান করা আর হল না।

প্রভুর রকম দেখি যোগী বুদ্ধিহারা।
বুঝিতে না পারে কিছু করিতে কিনারা।।
বিফল হইল তার যত উপদেশ।
হরিনামে আত্মহারা প্রভু পরমেশ।।

গেলেন আর এক যোগী মহাত্মা রামদয়াল মজুমদারের কাছে। তিনি কতকগুলি ক্রিয়াযোগ দিলেন; যাতে প্রাণবায়ু ষট্‌চক্র স্পর্শ করে। সীতারাম কিছুদিন কাজ করার পর প্রাণ বায়ুকে ষট্‌চক্রে আর কিছুতেই নামাতে পারলেন না। সে কথা বললেন গিয়ে দয়াল মহারাজকে। মহারাজ বুঝলেন সীতারামের যোগের কাজ আগে থেকে সব সারা হয়ে গেছে। বললেন—'জপ করে সব কাজ সেরে রেখেছ, নতুন করে আর যোগ হবে কি করে? তুমি যোগের অনেক ঊর্দ্ধে উঠে গেছ। এম. এ. পাশ করা ছাত্রকে প্রবেশিকার (মাধ্যমিকের) পাঠ দেওয়া বৃথা।'

ক্রমশঃ

অযাচিত কৃপালাভ

শ্রী শম্ভু দেবনাথ

চরণ ধরিতে দিও গো আমারে, নিওনা নিওনা সরায়ে।
জীবন মরণ সুখদুখ দিয়ে বক্ষে ধরিব জড়ায়ে॥

রবীন্দ্রনাথ।

বাংলা ভাষায় আত্মবিষয়ক যত শব্দ আছে, তার মধ্যে আত্মদর্শন বা আত্মোপলব্ধি সমধিক প্রণিধানযোগ্য, সাধনার মূল লক্ষ্যই হল আত্মদর্শন। সম্যক আত্মদর্শনই সাধককে ঈশ্বর দর্শনের উপযুক্ত করে তোলে। যে অবিনশ্বর আত্মা সাংসারিক মায়ামোহের কঠিন আবরণে আবৃত, শুদ্ধমনের সূক্ষ্ম অনুভূতি দ্বারা সেই আত্মদর্শনের বিকাশ লাভ ঘটে। ঘুচে যায় সমূহ ভেদজ্ঞান। আত্মা সর্বাত্মক তখনই অনুভূত হয়। সাধকের এই অবস্থায় কোন দুঃখ বা ক্লেশ থাকে না। তখন শুধু আনন্দ, অপার আনন্দ। সেই আনন্দের বার্তাই আসমুদ্র হিমাচলব্যাপী নামযজ্ঞের মাধ্যমে শ্রীশ্রীঠাকুর সীতারাম তাঁর সুদীর্ঘ জীবনে নিরলস ভাব আমাদের দিয়ে গেছেন। সেই আনন্দবার্তার ব্যাপ্তি, বিশালত্ব (মুদ্রিত হয়ে আছে তাঁরা বিপুল রচনা সম্ভার, যা নিষ্ঠা ও একাগ্রতার সঙ্গে পাঠ করলে আত্মদর্শন অবশ্যই হবে, এটা নিশ্চিত।

ভগবান সীতারাম আমাদের সেই অফুরন্ত আনন্দের দিকেই প্রতিনিয়ত ডাকছেন। আমরা কেউ তাঁর ডাক শুনি, কেউ শুনি না বা শুনতে পারি না। যারা শোনে না, সেই হতভাগাদের মধ্যে আমি একজন। কারণ আমার তো শুদ্ধ মন নেই। তাই কোনও সূক্ষ্ম অনুভূতিও নেই। তবে কিনা একটা কথা খুব দৃঢ়তার সঙ্গেই বলা যায় যে, সাধন পথে যতই দীনহীন হই না কেন, আমি সীতারামের আশ্রিত সন্তান। সীতারামের কৃপাধারা যে আমার মত অধমের উপর বর্ধিত হচ্ছে, মাঝে মাঝে তা এই বিষয় মলিন চিত্তেও ধরা পড়ে।

কোনও কাজ উপলক্ষে আমি বি.বা.দী. বাগ এলাকায় গিয়েছিলাম। তারিখটা ছিল ২৫শে শ্রাবণ, ১৪১৩ (ইং ১১-৮-২০০৬) R.L.O. (Returned letter office) বিল্ডিং-এর পাশ দিয়ে যাওয়ার সময় বিল্ডিং-এর উত্তরদিকের কোনে সুউচ্চ কার্নিশে সাজিয়ে রাখা অনেক বই ছিল। অধিকাংশই পুরোনো বই। তারমধ্যে ইংরাজী বই-এর সংখ্যাই বেশি। বই সংগ্রহ করার একটা সখ অবশ্য আমার আছে। থমকে দাঁড়িয়ে কিছুক্ষণ বইগুলো দেখলাম। হঠাৎ সবিস্ময়ে লক্ষ্য করলাম, এতসব বইয়ের মধ্যে শ্রীশ্রীওঙ্কার সহস্রলিপি বইটি রয়েছে। বিস্মিত হওয়ার কারণ এই যে, আমার ধারণা ছিল, ফুটপাথের ধারে যে সব পুরোনো বই বিক্রি হয়, পাঠকগণ সেই সমস্ত বই পড়ার পর অপ্রয়োজনীয় ভেবে কিম্বা সংগ্রহের তালিকায় বাহুল্য ভেবে কমদামে বিক্রি করে দেয়। তবে আর যাই হোক, শ্রীশ্রীওঙ্কার সহস্রলিপি ফুটপাথের অপ্রয়োজনীয়, পরিত্যক্ত বই-এর সমগোত্রীয় নয়। পক্ষান্তরে কালীনিবাসিনী গঙ্গামার হাত বদল হয়ে শ্রীশ্রীওঙ্কার সহস্রলিপি কি করে এই বি.বা.দী. বাগ অঞ্চলে R.L.O. বিল্ডিং-এর কার্ণিশে এল, তা-ও একটা ভাববার বিষয়।

একেই বলি সীতারামের কৃপাধারা। কারণ শ্রীগুরু প্রকাশনের সংগৃহীত বই-এর মধ্যে শ্রীশ্রীওঙ্কার সহস্রলিপি তখন পর্যন্ত সংগৃহীত হয়নি। সীতারামের ঐশ্বরিক লীলায় এই বইটি এই ভাবেই সংগ্রহ করা গেল। পক্ষান্তরে এই বইটি পাঠ না করলে সীতারামের অনেক কিছুই অনধীত থেকে যেত।

শ্রীশ্রীওঙ্কার সহস্রলিপিটি হাতে নিয়ে খুলতেই আর এক প্রস্থ বিস্ময়ের পালা। সবিস্ময়ে দেখলাম শ্রীশ্রীঠাকুরের বিশিষ্ট সন্তান ত্রিদণ্ডীস্বামী মাধব রামানুজ জীয়র স্বহস্তে লিখে বইটি অর্পণ করেছেন

এইভাবে—'পরমপ্রীতি নিলয়া গুরুভগ্নী গঙ্গামাতার শ্রীকরকমলে সাদরে অর্পণ করলাম।' শ্রীশ্রীঠাকুরের দাসানুদাস মাধব রামানুজ—২২।৩।৯৫।

সীতারামের ভক্তমণ্ডলীতে যাঁরা তাঁর কৃতী সন্তান—ভক্তিতে নিষ্ঠায়, একাগ্রতায় যাঁরা অত্যুজ্জ্বল জ্যোতিষ্করূপে দেদীপ্যমান, তাঁদের নাম মোটামুটি জানি। সত্যি বলতে কি, গঙ্গামার পরিচিতি আমার কাছে অজানাই ছিল। তবে শ্রীশ্রীওঙ্কার সহস্রলিপিতেই ২৭০ পৃষ্ঠায় একটি পাদটীকায় লেখা আছে—'গঙ্গামা-শ্রীমৎ সন্তদাস বাবাজীর ভ্রাতুষ্পুত্রী ও মন্ত্রশিষ্যা বিদুষী, বিশিষ্ট সাধিকা-কাশীধামে শ্রীশ্রীঅন্নদাদেবী মাতৃআশ্রম, সংস্কৃত মহাবিদ্যালয় প্রভৃতির প্রতিষ্ঠাত্রী—শ্রীশ্রীঠাকুরের একান্ত আপনজন—একাধারে তাঁর মাতা ও কন্যাস্বরূপা।'

উপরোক্ত পাদটীকা অনুসারে শ্রীশ্রীঠাকুরের মন্ত্রশিষ্যা নন গঙ্গামা। অথচ শ্রীমৎ মাধব রামানুজ গঙ্গামাকে গুরুভগ্নী বলে সম্বোধন করেছেন। গঙ্গামাকে লেখা ২৭৩ পৃষ্ঠায় আর একটি পত্রে শ্রীশ্রীঠাকুর লিখেছেন আর কি বলবো তোর গুরুচরণে অনন্যা ভক্তি হোক, তুই ঠাকুরের কৃপায় প্রেমভক্তি লাভ কর।' অর্থাৎ গঙ্গা মার যিনি গুরু শ্রীমৎ সন্তদাস বাবাজীর কথাই হয়ত শ্রীশ্রীঠাকুর বলেছেন। তার মন্নাথ শ্রীজগন্নাথ, মদগুরু শ্রীজগৎগুরু'—এই সিদ্ধান্তে গঙ্গা মা অবশ্যই গুরুভগ্নী। আর আপনজন! এই বিশ্বব্রহ্মাণ্ডে কে নয় সীতারামের আপন। যেই হোক, যেমনই হোক সবাই যে সীতারামের আপন। কারণ বিশ্বসৃষ্টির মূলেই যে তিনি। আর সাধক সাধিকা হলে তো কথাই নেই। গঙ্গা মা যে বিশিষ্ট সাধিকা।

বিভিন্ন মঠ, তীর্থক্ষেত্র থেকে গঙ্গামাকে লেখা সীতারামের আটটি পত্র শ্রীশ্রীওঙ্কার সহস্রলিপিতে সন্নিবেশিত হয়েছে। শুধু কেবল কুশল বিনিময় নয়, একটি পত্র বাদে প্রতিটি পত্রই কলেবরে মোটামুটি দীর্ঘ। সাধন ভজনের জন্য শাস্ত্রীয় বিধান সম্বন্ধে যেমন উপদেশ, নির্দেশ দিয়েছেন, ব্যাখ্যা করেছেন সাধনার সুনির্দিষ্ট তত্ত্ব, অপরদিকে সীতারাম কোনও কোনও বিষয়ে গঙ্গামার কাছে শাস্ত্রীয় ব্যাখ্যা চেয়েছেন। লক্ষ্যণীয় এই যে আসমুদ্রহিমাচলব্যাপী শ্রীশ্রীঠাকুরের নাম প্রচারের এত ব্যস্ততার মধ্যেও গঙ্গামায়ের সঙ্গে বিভিন্ন সময়ে পত্রের মাধ্যমে যোগাযোগ রেখেছেন। এইসব সীতারামের এক ভাগবতীলীলা যার খবর শ্রীশ্রীওঙ্কার সহস্রলিপি পড়ে জানতে পারি।

শ্রীশ্রীওঙ্কার সহস্রলিপি আদ্যপান্ত পড়েছি। এর মধ্যে আছে ৩২৫টি পত্রাবলী। আর আছে ছন্দোবদ্ধবাণীমালা, প্রবন্ধ, চিরকূট, সংলাপ, উপদেশ ইত্যাদি। আমি ভক্ত নই, সাধকও নই, তবু এই বইটি পড়ে হয়তো আমার কিঞ্চিমাত্র আধ্যাত্মিক চেতনার উন্মেষ হতে পারে—তাই সীতারামের অযাচিত কৃপাবলে পাওয়া শ্রীশ্রীওঙার সহস্রলিপি আমার এক সুদুর্লভ সংগ্রহ। শ্রীশ্রীঠাকুরের স্বহস্ত লিখিত পত্র মানে তাঁকেই একেবারে কাছে থেকে পাওয়া। কোনও আন কথা নেই, পত্রের প্রতি ছত্রে-ছত্রে শুধু বেকল ঈশ্বর ভাবনার স্বতঃস্ফূর্ত প্রকাশ, যা আধ্যাত্মিক বিকাশলাভে একান্তই সহায়ক। পত্রে যেমন আছে রোগ নিরাময়ের নিধান, জপতপের নিয়ম পদ্ধতি, আচার অনুষ্ঠানের পালনীয় বিষয়, পুরুষ বাবাদের প্রতি, মায়েদের প্রতি উপদেশ, নির্দেশ, তেমনি আছে ব্যবহারিক জীবনের নানা খুঁটিনাটি সমস্যার সমাধান। তাঁর প্রতিটি পত্রই ঈশ্বর কেন্দ্রিক আধ্যাত্মিক ভাবনার উচ্চস্তরে প্রতিষ্ঠিত। বলা যায় সীতারামের অধ্যাত্ম সাগরের করুণাধারায় প্রতিটি পত্রই স্নাত। এককথায় জীবনের মুক্তি ও আনন্দলাভের সমুদায় উপাদান আছে এই শ্রীশ্রীওঙ্কার সহস্রলিপিতে।

এই যুগের প্রেক্ষিতে শ্রীশ্রীওঙ্কার সহস্রলিপির পত্রাবলীর মধ্যে একটি পত্রের উল্লেখ করছি। শ্রীশ্রীঠাকুরের একনিষ্ঠ সেবক শ্রী সুব্রত রায়চৌধুরীকে (কিঙ্কর জয়) নিভৃত নিবাস থেকে ৫।৪।৮৫ তারিখে লেখা এই পত্রটিতে শ্রীশ্রীঠাকুর লিখেছেন 'সত্য কথা হল সবাই ভাল, মন্দ বলে জগতে কিছু নেই, কারণ সমস্তই ভগবান, তখন মন্দ কোথা? ভাল মন্দ যে বলি সেটা না বোঝার জন্য।' শ্রীশ্রীঠাকুর বহুবার বলেছেন, কারও নিন্দে করলে, নিন্দিত ব্যক্তির পাপ, অপরাধ নিন্দাকারীর উপর বর্তায়। শ্রীশ্রীসারদা মায়ের বিখ্যাত

উক্তি কারও দোষ দেখো না, এক্ষেত্রে স্মর্তব্য। এই সম্বন্ধে শ্রীশ্রীঠাকুরের প্রেমী ভক্ত ও আশ্রিত সন্তানকে (পৃঃ ২২৬) আরও লিখেছেন, সব তিনি। সব তিনি। কেউ শত্রু নয়, কেউ কোন দোষ করেনি।

যতদিন স্বীয় দোষ তোমার থাকিবে।
ততদিনে পরদোষ দেখিতে পাইবে।।
যার তুমি দোষশূন্য হবে মতিমান।
তখন দেখিবে প্রিয় সব ভগবান।।

শ্রীশ্রীঠাকুরের এই প্রেমের বাণী যদি আমরা কায়মনোবাক্যে পালন করতে পারি, তবে কোন সমস্যাই আমাদের জীবনে থাকবে না। পাঁচশো বছর আগে এই বঙ্গদেশেই প্রেমের উদ্‌গাতা আর এক অবতার পুরুষ শ্রীমন্ মহাপ্রভু এই ভাবেই আমাদের মধ্যে অকাতরে প্রেম বিলিয়ে গেছেন। কিন্তু হায় যে, বর্তমান যুগ, বাস্তব ক্ষেত্রে আমরা এইসব সারসত্য ভুলে গিয়ে অপরের ছিদ্রান্বেধন করে বেড়াই। কত দোষ আমরা দেখি যে, আপাত দোষের কিছু ঘটলে আমরা কেউ কাউকে রেয়াত করি না। সেজন্য মাঠে ঘাটে, স্কুল কলেজে, বাসে, ট্রেনে একটু দোষের স্ফুলিঙ্গ দেখা দিলে, তা মুহূর্তে দপ্ করে জ্বলে ওঠে। এত প্রেমহীনতা, অসহিষ্ণুতা আমাদের গ্রাস করেছে যে কোথায় কোন রসাতলে নিয়ে যাবে, তা সীতারামই জানেন।

সেদিন এক স্বামীজীর ভাষণ শুনছিলাম। তিনি বললেন 'এখন তো কলিকাল, এই কলি শব্দটা এসেছে কলহ থেকে। এখন সর্বত্র কলহ—একই পরিবারের মধ্যে কলহ, বৃহত্তর পরিধিতে এক পরিবারের সঙ্গে অন্য পরিবারের কলহ, এক পাড়ার সঙ্গে অন্য পাড়ার কলহ, এক রাষ্ট্রের সঙ্গে অন্য রাষ্ট্রের কলহ চলছে। চারদিকে শুধু কলহে আর কলহ। তার ফলে বিক্ষোভ, সংঘর্ষ, রক্তপাত, মৃত্যু—চরম অশান্তি। এই প্রেমহীন, ক্ষমাহীন এই সংসারে এটাই বোধহয় কলিকালের নিয়তি।

বর্তমানে আমরা এক ভয়ঙ্কর যুগ সন্ধিক্ষণে দাঁড়িয়ে আছি। আগের সবকিছু তুলে দেবার, মুছে দেবার আত্যন্তিক প্রয়াস চলছে। সীতারাম বলে দিয়েছেন, এর বিষময় পরিণতি আমাদের ভুগতে হবে। হচ্ছেও তাই। দিকে দিকে তারই অসংখ্য ছবি আমরা প্রতিদিন দেখতে পাচ্ছি। আমি যে অঞ্চলে থাকি, তার নাম কৈখালি। যখন এখানে আসি, তখন দেখেছি কত গাছপালা। ছোট, বড়, মাঝারি কত পুকুর ডোবা—একটা স্নিগ্ধ শ্যামল পরিবেশ। আর এখন কত পুকুর-ডোবা ভরাট হয়ে গেছে। তার উপর বড় বড় ফ্ল্যাট তৈরী হয়েছে। ফ্ল্যাটে ফ্ল্যাটে ছয়লাপ। অবশ্য এই অবস্থা এখন সর্বত্রই চলছে। মাঝে মাঝে হাঁপিয়ে উঠি। কারুর সঙ্গে যে একটু প্রাণখুলে কথা বলব, তার উপায় নেই। সবাই ভীষণ ব্যস্ত। তাছাড়া এখন আমরা একটা সন্দেহের ঘেরাটোপে বাস করছি। কেউ কাউকে বিশ্বাস করতে পারি না। যদি বা কারও সঙ্গে কথা হয় তবে বিষয় প্রসঙ্গ এসে পড়ে, নয়তো রাজনীতি কিম্বা পরনিন্দা, পরচর্চা। দু'একজন ছাড়া কেউ ঈশ্বর কথা বলে না, শোনেও না। ঘোর কলিকাল!

ত্রিদণ্ডীস্বামী শ্রীমৎ মাধব রামানুজ জীয়র এখন স্থূলে নেই। কিন্তু তিনি যে অক্লান্ত পরিশ্রম করে ভক্ত, আশ্রিত, সেবকদের কাছে লেখা পত্রসমূহ সংগ্রহ করে শ্রীশ্রীঠাকুরের অধ্যাত্ম চেতনার দিব্যমালা গেঁথে আমাদের উপহার দিয়ে গেছেন, তার জন্য তাঁকে কৃতজ্ঞতা জানাই। আর তাঁর শ্রীচরণ স্মরণ করে দণ্ডবৎ প্রণাম জানাই।

জয়গুরু, জয় সীতারাম।

অন্তরের অন্তঃস্থলে হে মহারাজ

অ প র্ণা ব্যা না র্জী

'অন্তরে তুমি আছো চিরদিন
ওগো অন্তরযামী।'

এই গানটি গাওয়ার সময় তোমার হাসিমাখা মুখটি মনে পড়ে। কারণ তুমি আছো আমাদের অন্তরের অন্তঃস্থলে। আমি ৮ই নভেম্বর সন্ধ্যার কিছু আগে কুলটিকরীর মহামিলন মন্দির প্রাঙ্গণে বসে আছি একা, হঠাৎ মনে পড়ে গেল সেই ছোটবেলার কথা। আমি বেশ ছোট, মা একদিন নানারকম ঠাকুরের গল্প বলছিলেন আমাকে ও দাদাকে। সেইসময় তারকদার (মহিমানন্দজী) কুলটিকরীতে আসার কথা তাই নাম হবে, ঠাকুরকথা হবে এই সমস্ত কথা বলেছেন তখন আমি, মাকে বললাম মা ঠাকুর কখন আসে? মা বললেন যখন ভক্তরা আকুল হয়ে কাঁদে আর ডাকে তখন ঠাকুরের আসন টলে ওঠে, তিনি আর স্থির থাকতে পারেন না। ভক্তের আকুল কান্নায় ছুটে আসেন ভক্তের কাছে তাই তো টাকুর আসছেন আমাদের দেখতে। এই সমস্ত ভাবছি, হঠাৎ ঘণ্টার আওয়াজ শুনে বুঝলাম আরতি শুরু হয়ে গেল মন্দিরে। এই সন্ধ্যার সময় বড় ভালো লাগে, কারণ এইসময় সবার বাড়ি যেন মন্দির হয়ে যায়, শঙ্খের আওয়াজ, ধূপের গন্ধ প্রদীপ জ্বলে সব মিলিয়ে এক আনন্দময় পরিবেশ তৈরী হয়। যাইহোক মহারাজজী আসছেন কুলটিকরীতে তাই সাজো সাজো রব চলছে চতুর্দিকে। রাত্রি ৭টা বাজে তখনও তিনি চন্দননগর থেকে গাড়ীতে চাপেন নি শুনে সবাই চিন্তায় পড়ে গেল। অনেক রাত্রি হবে মহারাজজীর আসতে। প্রচুর লোকজন তখন মন্দিরে, নাম চলছে খুব সুন্দর সুরে আর আমি চুপচাপ রাধামাধবের মন্দিরের সামনে বসে ভাবছি সত্যিই আজ ভক্তের কান্না তোমার কাছে পৌঁছেছে তাই তো তুমি আসছো প্রভু এই ভক্তিহীন অভাগা সন্তানদের কৃপা করতে। তোমার আসার পথ চেয়ে কত মানুষ বসে আছে, সবাই ভাবছে মহারাজজীর আসতে যত রাত্রিই হোক দেখা করে প্রণাম করে প্রসাদ নিয়ে বাড়ী যাবো। কিন্তু শেষে মহারাজজীর আসতে এত রাত্রি হলো যে ৫০-৬০জন ছিল আর সবাই বাড়ী চলে গেল মনের দুঃখে, কারণ ঠাণ্ডা পড়ে গেছে, বিশেষ করে গ্রামে ঠাণ্ডা একটু আগেই পড়ে যায়। তাদের প্রত্যেকের মুখের মধ্যে ছিল প্রতীক্ষার ছাপ, কালকে সকালে যেন প্রভু তোমায় দেখতে পাই সেই যেন আগের মতো করে। কারণ তুমি যে আমাদের জীবনের 'ধ্রুবতারা' তাই তো রবীন্দ্রনাথ বলেছেন 'তোমারেই করিয়াছি জীবনের ধ্রুবতারা, এ সমুদ্রে আরও কভু হবো নাকো পথহারা।'

রাত্রি বাড়ছে, নাম শুনছি আর যারা বাড়ী ফিরে যাচ্ছে তাদের মুখের দিকে তাকিয়ে ভাবছি তাদের প্রত্যেকের মুখে সেই প্রতীক্ষার ছাপ, ঠিক যেন 'শবরীর' মত। সেই ছোটো থেকে দিনের পর দিন বাল্য, যৌবন, প্রৌঢ় সমস্ত বয়স চলে গেল, শুধু প্রতীক্ষা কখন ভগবান 'রাম' আসবেন, তার গুরুদেব বলেছেন ভগবান 'রাম' আসবেন তাই সে কথার ওপর বিশ্বাস করে সে অপেক্ষা করছে যখন 'শবরী' দেখলো চন্দনবাটা থেকে চন্দন শুকিয়ে গেছে, ফুলের মালা শুকিয়ে ঝরে যাচ্ছে, পাথরের থালায় জল রাখা ছিল ভগবানের চরণ ধোয়ানোর জন্য তাও শুকিয়ে গেছে তাই দেখে 'শবরী' আকুল হয়ে কাঁদছেন পথপ্রান্তে চেয়ে চেয়ে কবে আসবে প্রভু। শবরী এই প্রতীক্ষা দেখে ভগবান স্থির থাকতে পারেননি ছুটে এসেছিলেন তার কাছে। তাই হয়েছে আজ। আমাদের মেদিনীপুর জেলার মানুষ প্রতিদিন সকালে স্নান করে ঠাকুরের কাছে বসে কাঁদতে কাঁদতে জপ করেছে আর বলছে আর কতদিন তোমার প্রতীক্ষায় থাকবো প্রভু এবার তুমি এসো। আমাদের পাথরের থালায় জল রাখা নেই আছে শুধু চোখের জল সেও যে শুকিয়ে যাচ্ছে প্রভু কবে কৃপা হবে এই দীনদুঃখী সন্তানদের দেখা দাও প্রভু। তাই তো তিনি দীনদুঃখী মানুষের অশ্রুজল দেখে থাকতে পারেননি ছুটে আসছেন তাদের কাছে এইভাব নিয়ে—

দীন হয়ে জপনাম জপ নিশিদিন
দীনবন্ধু দেন দেখা হলে পরে দীন।
অন্তরের অন্তঃস্থলে যা আছে তোমার
নয়ন সমক্ষে সব ভাসিছে তাঁহার।।

আর ভক্তের প্রতীক্ষা তিনি খুব ভালবাসেন, তাই তো বলেছেন—

'জপিতে জপিতে নাম প্রতীক্ষা আসিবে
অহরহ পথ পাণে চেয়ে তুমি রবে।
আসিবেন প্রাণারাম হাসিতে হাসিতে
দাস সীতারাম নাম ভুলোনা জপিতে।।'

এই কান্না, প্রতীক্ষা সব কিছু দেখে তিনি সুদূর ওঁকারেশ্বর থেকে ছুটে এসেছেন আমাদের কাছে দু-দিন আনন্দ দেওয়ার জন্য, তাই তো তিনি ভগবান। তিনি যখন রাত্রি ১১-৩০টায় গাড়ী থেকে নামলেন তখন দেখি সেই হাসিমাখা মুখে সবার সঙ্গে কথা বলছেন, কোনও ক্লান্তি নেই তাঁর শরীরে, তিনি যেন দু-হাত বাড়িয়ে ডাকছেন কেন তোরা কাঁদছিস? এই দেখ্ আমি তোদের কত ভালবাসি। সত্যিই প্রভু তুমি ভালবাসো বলেই তো আমরা তোমাকে এত ভালবাসি। রাত্রিতে মহারাজজী আসার পর সবাই প্রণাম করে প্রসাদ গ্রহণ করে চলে এলাম বাড়ীতে, কিন্তু ঘুম আসেনি কারুরই চোখে, সবাই প্রভাত হওয়ার অপেক্ষায় ছিল। আলো ফোটার মুখর প্রভাতী সুরে নাম শুরু হয়ে গেল ও সমস্ত মানুষ ছুটে এলো তাদের ভগবান দর্শনের জন্য। এতদিনের প্রতীক্ষা একি সহজ কথা! মহারাজজী সকালে হাঁটছেন, তারই মধ্যে সবাই প্রণাম করছেন এবং তিনি সবার সঙ্গে হাসিমুখে কুশল সংবাদ নিচ্ছেন, এই হচ্ছে আমাদের মহারাজজী। তিনি যেন সবার সঙ্গে মিলিত হয়ে যান, তাঁর সব সন্তান যেন তাঁর কাছে একরকম, কারুর জন্য কমবেশী নয়। এরপর সমস্ত Program শুরু হলো। সমস্ত Program এ তিনি উপস্থিত ছিলেন, তাই যারা উৎসবের কর্মী ছিলেন তাদের মধ্যেও আনন্দ ছিল প্রচুর। সবাই যেন এক আনন্দময় পরিবেশে আছি। প্রথমে শুরু হলো নগর পরিক্রমা নাম সহযোগে। এই নাম নিয়ে যখন দেখা হচ্ছে তখন মহারাজজীকে দেখে মনে হচ্ছিল স্বয়ং শ্রীচৈতন্যদেব নেমে এসেছেন কুলটিকরীতে। তাই সবাই মনে মনে বলে উঠেছে—

'যদি গৌরাঙ্গ না হতো কি মেনে হইত
কি মেনে ধরিতাম দেহে।
রাধার মহিমা প্রেমরস সীমা
জগতে জানাত কে, ওরে কে জানাতো।।'

সত্যিই গৌরাঙ্গ ছাড়া যেমন 'রাধা'র মহিমা জানা যেন না তেমনি মহারাজজী ছাড়াও সীতারামের কথা দেশে-বিদেশে প্রচার করতো কে? তাই তো সীতারাম নিজেই মহারাজজীকে তৈরী করেছেন ঠিক নিজের মতো করে জগৎ-এর কল্যাণের জন্য। তাই তো তাঁকে দেখতে ঠিক গৌরাঙ্গদেবের মতো। যাক্ এরপর শুরু হলো বড় বড় ডাক্তার দ্বারা ব্লাড টেস্ট এবং মেডিকেল চেকাপের ক্যাম্প, সবকিছুই যদিও ডাক্তার গিরী মহাশয়ের সাহায্যে হয়েছে। মহারাজজী, ডাক্তারবাবুর নাম দিয়েছেন 'গিরী গোবর্ধন'। কারণ তিনি এই কর্মকাণ্ড করে চলেছেন নিঃস্বার্থভাবে। মহারাজজী ডাক্তারবাবুকে বলেছেন সপ্তাহে একদিন অন্ততঃ বিনা পয়সায় চিকিৎসা করার জন্য, তাহলে বহু গরীব মানুষের উপকার হবে। এরপর যোগশিবিরে যোগ শেখালেন। তারপর প্রসাদ পাওয়ার পালা, হাজার হাজার মানুষ প্রসাদ পেল। কিন্তু যেই না ঘড়ির ঘণ্টা বিকেল পাঁচটা বেজে উঠলো, তখন হলো বিদায়ের পালা। মহারাজজী গাড়ীতে উঠলেন কুলটিকরী থেকে খড়গ্পুর হয়ে তমলুকের উদ্দেশ্যে রওনা হলেন। কুলটিকরীবাসীরা তখন চোখের জলে গলা-বুক ভিজিয়ে ফেলে মনে মনে বলছে আবার কবে তোমার সঙ্গে দেখা হবে প্রভু তা তো জানিনা, কিন্তু তুমি একজনকে কাঁদাও আর একজনকে হাসাও প্রভু, এখন যেমন কুলটিকরীর বাসিন্দা কাঁদছে আর খড়গ্পুরবাসীরা হাসছে কারণ তাদের কাছে তুমি আসছো। এইভাবে তুমি সবাইকে কখনো কাঁদাও আবার কখনো হাসাও এই তোমার কাজ। একবার ঠাকুরের সঙ্গে ভাস্করদার কথা হচ্ছে, ভাস্করদা ঠাকুরকে জিজ্ঞাসা করলেন ঠাকুর আপনি যখন কোথাও যান, তখন সবাই কতো আনন্দ করে, কিন্তু যখন চলে যান সবাই কাঁদে, তখন ঠাকুর বলেন ওরে যখন তোরা মানে যারা 'এ'র সঙ্গে আছিস্ তোরাও যখন কোথাও যাবি এমন ঘটনা ঘটবে। তাই হচ্ছে এখন সবাই কাঁদছে আর মনে মনে বলছে—

'তব মুখ সদা মনে জাগিতেছে সংগোপনে
তিলেক অন্তর হলে না হেরি কূল-কিনারা
কখনও বিপথে যদি ভ্রমিতে চাহে এ হৃদি
অমনি ও মুখ হেরি শরমে সে হয় সারা।
তোমারেই করিয়াছি জীবনের ধ্রুবতারা।।'

॥ শ্রীশ্রীগুরবে নমঃ ॥

অনন্তশ্রীঠাকুর ওঙ্কারনাথদেবের ১২৪তম শুভ আবির্ভাব মহোৎসব

শ্রীগুরুবিগ্রহেষু/শ্রীগুরুমূর্ত্তিষু,

ভুবনমঙ্গলবিগ্রহ অনন্তশ্রীঠাকুর ওঙ্কারনাথদেবের ১২৪তম শুভ আবির্ভাব মহোৎসব সম্প্রদায়ের কেন্দ্রীয় কার্যালয়, মহামিলন মঠে আগামী ২৩, ২৪ এবং ২৫শে মাঘ (৭, ৮ এবং ৯ই ফেব্রুয়ারী, ২০১৫) ১৪২১ শনিবার, রবিবার এবং সোমবার নানা অনুষ্ঠানের মাধ্যমে পালিত হবে।

আপনার সপরিবার সবান্ধব উপস্থিতি এবং সার্বিক সহযোগিতা আমরা ঐকান্তিকভাবে প্রার্থনা করি।

ঃ নিবেদক ঃ

শ্রীগুরুদেবের দাসানুদাস

শ্রীপল্লব গুপ্ত	**অধ্যাপক ডঃ গোপাল মিত্র**	**কিঙ্কর বিঠ্ঠল রামানুজ**
কোষাধীশ	*সঞ্চালক*	*সর্বাধীশ*

অখিল ভারত জয়গুরু সম্প্রদায়

মহামিলন মঠ

যোগাযোগ ঃ মঠাধ্যক্ষ কিঙ্কর প্রণবানন্দ (মহামিলন মঠ)

৭/৭, পি. ডব্লিউ. ডি. রোড, কলকাতা - ৭০০ ১০৮, দূরভাষ ঃ ২৫৭৭-৫১৭৯

অনন্তশ্রীঠাকুর ওঙ্কারনাথদেবের ১২৩তম শুভ আবির্ভাব মহোৎসব

ওঙ্কারনাথ মিলন মন্দির, হালিশহর (স্টেশনের পশ্চিমপার্শ্বে)

৮ই জানুয়ারী হইতে ১১ই জানুয়ারী, ২০১৫

ঃ পরিচালনায় ঃ

অখিল ভারত জয়গুরু সম্প্রদায় ও ওঙ্কারনাথ মিশন (লোককল্যাণ শাখা) হালিশহর

উক্ত অনুষ্ঠানে সকল ভক্তবৃন্দ ও ভগবত অনুরাগীদের সাদর আমন্ত্রণ জানাচ্ছি।

আনন্দ সংবাদ

পূজ্যপাদ সর্বাধীশ কিংকর বিঠ্ঠল রামানুজ কর্তৃক হালিশহর ওঙ্কারনাথ মিলন মন্দির ওঙ্কারনাথ মিশন (লোককল্যাণ শাখা) অনুমোদিত

বিনামূল্যে চক্ষুপরীক্ষা (প্রতিমাসে ২দিন অভিজ্ঞ ডাক্তার দ্বারা), **স্বল্পমূল্যে ছানি অপারেশন ও চশমা প্রদান।**

প্রতিবছর শ্রীশ্রীঠাকুরের আবির্ভাব উৎসবে দুঃস্থদের বস্ত্র বিতরণ এবং বিনামূল্যে স্বাস্থ্যশিবির।

ঃ যোগাযোগ ঃ

ওঙ্কারনাথ মিলন মন্দির, হালিশহর (মোবাইল ঃ ৯০০৭১২৩০৩৭

ভুবনেশ্বর শ্যামাশঙ্কর মঠে একমাসব্যাপী প্রতিকী চাতুর্ম্মাস্য উৎসব।

শ্রী র তি কা ন্ত মি শ্র

ভগবান শ্রীশ্রীসীতারামদাস ওঙ্কারনাথদেব প্রতিষ্ঠিত ভুবনেশ্বরস্থিত শ্যামাশঙ্কর মঠে একমাসব্যাপী প্রতিকী চাতুর্ম্মাস্য ব্রত উৎসব ২৭শে আষাঢ় গুরুপূর্ণিমা থেকে শুভারম্ভ হয়েছিল। শ্রীশ্রীঠাকুরের প্রিয় সন্ন্যাস শিষ্য শ্রীশ্রীমাধবরামানুজজীয়র স্বামীজীর দ্বারা বহু বৎসর পূর্বে এই মঠে চাতুর্ম্মাস্য ব্রতের শুভ সূচনা হয়।

বর্তমানে সকলের কর্মব্যস্ততা ও সময়ের অভাব হেতু এই ব্রত অনিচ্ছাকৃতভাবে সংক্ষিপ্ত করতে হয়। তাই মহারাজজীর আদেশ ছিল সাধুদের কমপক্ষে দুইমাস এবং গৃহীদের কমপক্ষে একমাস এই ব্রত রাখা উচিত। তাই মহারাজজীর আদেশানুসারে প্রতি বৎসরের ন্যায় এ বৎসরেও ২৭শে আষাঢ় গুরুপূর্ণিমাতে আরম্ভ হয়ে ২৪শে শ্রাবণ ঝুলন পূর্ণিমাতে শেষ হয়। পরেরদিন ২৫শে শ্রাবণ শ্রীনাম বিশ্রাম নেন।

এই উৎসবকে কেন্দ্র করে স্থানীয় জনগণের বিশেষ উৎসাহ ও উন্মাদনা পরিলক্ষিত হয়। ভুবনেশ্বরের বাহিরে উড়িষ্যার বিভিন্ন জেলা এমনকি পশ্চিমবঙ্গের বিভিন্ন জেলা থেকেও ভক্ত-শিষ্যগণের উৎসাহ এবং সমাগম হয়েছিল। মঠের প্রাণপুরুষ ঠাকুরের অশেষ প্রীতিভাজন শ্রীযুক্ত শঙ্করদা এবং তাঁর সুযোগ্যা সহধর্মিণী শ্রীমতী শিখাদিদির যথাসাধ্য আয়োজন এবং আতিথেয়তায় এই অনুষ্ঠানসহ অন্যান্য আনুষঙ্গিক অনুষ্ঠানগুলি প্রাণবন্ত হয়ে ওঠে।

শ্রীশ্রীঠাকুর বলেছেন ''এ কলিযুগে অন্যপ্রকার গতি নাই। হরিনাম, হরিরনাম, হরির নামই পরমগতি।'' তাই এই অনুষ্ঠানে একমাসব্যাপী চলেছে শ্রীনামের অহোরাত্র মহানাম যজ্ঞ। সঙ্গে সঙ্গে ভুবনেশ্বরে চলেছে এই আশ্রমের পরিচালনায় শ্রীনামপ্রচারের মহা পরিক্রমা। শ্রীনাম ভুবনেশ্বরে খেলা করেছেন, নৃত্য করেছেন আকাশে-বাতাসে, জলে-স্থলে সর্বত্র।

অহোরাত্রব্যাপী শ্রীহরিনাম যজ্ঞ এবং পরিক্রমা, প্রচারে অংশ নিয়েছিলেন পশ্চিমবঙ্গের পূর্ব এবং পশ্চিম মেদিনীপুর সহ ভুবনেশ্বরের কাছাকাছি দক্ষ ও ভক্ত নামকারীবৃন্দ। এই মহানাম যজ্ঞে ভুবনেশ্বরের সতীসংঘের মায়েরা প্রতিদিন ২ ঘণ্টা শ্রীনামে অংশ নেন। একমাসব্যাপী উৎসবের মধ্যে বিশেষ উৎসব হিসাবে 'নবরাত্র' এবং 'ঝুলনযাত্রা' বিশেষ উৎসব হিসাবে পালিত হয়। প্রতি সন্ধ্যায় ঝুলনারতী এবং নৃত্য সহযোগে বিশেষ ভজন কীর্ত্তনানুষ্ঠান। প্রতিদিন চলেছে ত্রৈকালিক প্রার্থনা, শ্রীশ্রীগুরুগীতাপাঠ, শ্রীশ্রীবিষ্ণুসহস্রনাম পাঠ, শ্রীশ্রীমদ্ভাগবত পাঠ ইত্যাদি অনুষ্ঠান। আশ্রমে কয়েকজন সাধু-সন্ত তাঁদের জপ-ধ্যান, মৌন, শাস্ত্রপাঠের মাধ্যমে তপস্যায় রয়েছেন।

একমাসব্যাপী প্রতিদিন শতাধিক ভক্ত, দরিদ্রনারায়ণ প্রসাদ সেবন করেছেন। বিশেষ বিশেষ দিনে সংখ্যাটা বেড়ে দুই থেকে তিনশত হয়ে যায়। মঠাধ্যক্ষ শঙ্করদা এবং শিখাদিদি তাঁদের যথাযোগ্য আতিথেয়তায় নিয়ত রয়েছেন।

শ্রীনামের বিশ্রাম ২৫শে শ্রাবণ দিনটি ধর্মসভাসহ বিশেষ অনুষ্ঠানের মাধ্যমে সম্পূর্ণ হয়। এই ধর্মসভার প্রধান পুরোহিত ছিলেন পণ্ডিতপ্রবর ডঃ প্রভাকর মিশ্র। তিনি শ্রীশ্রীঠাকুরের উৎকলে শ্রীনামপ্রচার, সীতারামই পরমব্রহ্ম ইত্যাদি ঠাকুরকথায় অবলীলায় ঘণ্টাধিককাল সকলকে মন্ত্রমুগ্ধ করে রাখেন।

বিশিষ্ট নামকারী যাঁরা এই একমাসকাল শ্রীশ্রীঠাকুরের নামপ্রচার এবং অহোরাত্রব্যাপী নামযজ্ঞে যথেষ্ট সহযোগিতা করেছিলেন তাঁদের সতীসংঘের পক্ষ থেকে সভানেত্রী শ্রীমত্যা পার্ব্বতী সাহুদিদি বস্ত্রাদি দানে সম্মান জানান। সর্বশেষে মঠাধ্যক্ষ শঙ্করদাদা একমাসব্যাপী নামযজ্ঞের বিশ্রাম ঘোষণা করেন।

শুধু এই একমাসব্যাপী অনুষ্ঠান নয়, মঠাধ্যক্ষ শঙ্করদা এবং তাঁর সুযোগ্যা সহধর্মিণী শ্রীমতী শিখাদিদি এই দেবদম্পতি জগত সংসারের সব আকর্ষণ ভুলে আশ্রমের সার্বিক উন্নয়নে মন-প্রাণ সমস্ত উৎসর্গ করে দিয়েছেন। এঁদেরই সুষ্ঠু পরিচালনায় গড়ে উঠেছে শ্রীশ্রীঠাকুরের প্রিয় সতীসংঘ, সর্বাধীশ কিঙ্কর বিঠ্ঠল রামানুজজীর প্রতিষ্ঠিত ওঙ্কারনাথ মিশন।

সতীসংঘের পরিচালনায় চলছে একটি দাতব্য চিকিৎসালয়—যেখানে দীন-দুঃখীজন বিনা ব্যয়ে সুচিকিৎসা পরিষেবা পান। চলছে অবৈতনিক সীতারাম কমলা শিশু মন্দির। যেখানে অত্যন্ত দরিদ্র পরিবারের ছেলেমেয়েরা শিক্ষালাভ করছে অবৈতনিক ভাবে। সতীসংঘের পরিচালনায় চলছে নামগান, সৎগ্রন্থ পাঠ, ঠাকুরকথা। চলছে বস্ত্রদান, অন্নদানসহ বিভিন্ন কর্মসূচী। সতীসংঘের সেবামূলক কাজে দানের উপর উড়িষ্যা সরকার ৮০(জি) আয়কর ছাড়ের সুবিধা অনুমোদন করেছেন। সতীসংঘের পরিচালনায় এবং শ্রীশ্রীঠাকুরের আদেশপ্রাপ্ত শিখাদিদির পৃষ্ঠপোষকতায় উড়িষ্যার একমাত্র পত্রিকা 'সুভদ্রা' প্রকাশিত হচ্ছেন।

শ্রীশ্রীঠাকুরের লীলাকুঞ্জে শ্রীশ্রীজগন্নাথ দর্শন এবং 'যা যা নাম দিগে যা'-কে স্মরণ করে 'ওঙ্কারনাথ মিশন' কর্তৃক চলছে সারা বৎসরব্যাপী উড়িষ্যায় শ্রীনাম প্রচার। এ ছাড়া চলছে মিশনের পরিচালনায় ফিজিওথেরাপি, এক্সরে, বিভিন্নরকম শারীরিক পরীক্ষার প্যাথোলজি সেন্টার, প্রতিষ্ঠিত সু-চিকিৎসক দ্বারা সু-চিকিৎসার ব্যবস্থা, আর্তদের সেবা ইত্যাদি। দুঃস্থ-দরিদ্র ব্যক্তি বিনামূল্যে এই পরিষেবা পেয়ে আসছেন। এই মিশনের তত্ত্বাবধানে চলে Blood Donation Camp। সংঘের সর্বাধীশ এবং ওঙ্কারনাথ মিশনের প্রতিষ্ঠাতা কিঙ্কর বিঠ্ঠল রামানুজজীর উড়িষ্যা আগমনে ভুবনেশ্বরের শ্যামাশঙ্কর মঠ আশ্রম এবং ওঙ্কারনাথ মিশনের কাজকর্ম পরিদর্শনসহ প্রতিনিয়ত কর্মকুশলতার প্রশংসা করেন।

শ্রীশ্রীঠাকুর ভুবনেশ্বরে শ্রীশ্রীশ্যামাশঙ্কর মঠে উপরোক্ত কর্মযজ্ঞসেবার দায়িত্বভার যাঁদের উপর ন্যস্ত করেছেন সেই দেব-দম্পতি, মঠের প্রাণপুরুষ, সকলের অশেষ প্রীতিভাজন শ্রীযুক্ত শঙ্করদাদা এবং তাঁর সুযোগ্যা সহধর্মিণী শ্রীমতী শিখাদিদিকে জানাই আমার সশ্রদ্ধ ভক্তিনম্র প্রণাম।

অলম্ বিস্তারেণ।

সমস্ত আশ্রমের গুরুভাইদের প্রতি বিনীত নিবেদন ঃ

যত তাড়াতাড়ি সম্ভব তাঁহারা যেন নিজ নিজ গ্যাস ডিলার-এর সঙ্গে প্রয়োজনীয়
কাগজপত্র নিয়ে যোগাযোগ করেন। তা নাহলে ভবিষ্যতে গ্যাস পেতে
অসুবিধা হতে পারে।

টাটকাপুরে ওঙ্কারনাথ মিশনের স্বাস্থ্য পরীক্ষা শিবির

কি ঙ্ক র স মী র ণ

পূর্ব মেদিনীপুরের একটি ছোট্ট গ্রাম। নাম টাটকাপুর। কোলকাতা থেকে প্রায় একশো আশি কি.মি. দূরে। শ্রীশ্রীঠাকুরের একটি মন্দির আছে। পরমগুরুদেব শ্রীদাশরথিদেব যোগেশ্বর এবং ঠাকুর শ্রীশ্রীসীতারামদাস ওঙ্কারনাথদেবের মর্মর মূর্ত্তির ঐ মন্দিরে নিত্য সেবা হয়। ১৪১৫'র ১৫ই ফাল্গুন (২৭শে ফেব্রুয়ারী, ২০০৯) এ মন্দির উদ্‌বোধন হয়। এখানে পরমপূজ্য পরমহংস শ্রীশ্রীমাধবস্বামীজী এসেছিলেন। এসেছিলেন দিগ্‌সুই-এর পরমগুরুদেবের নাতি শ্রীগোবিন্দজী, এসেছিলেন অখিল ভারত জয়গুরু সম্প্রদায়ের বর্তমান সর্বাধীশ কিঙ্কর বিঠ্‌ঠল রামানুজজী মহারাজ। অপূর্ব প্রাকৃতিক পরিবেশের মধ্যে আমাদের এই মন্দিরটি। সামনেই এক বিশাল দীঘির মত একটা পুকুর। বিশাল বড় একটা ফুটবল খেলার মাঠ আর তৎসংলগ্ন শ্যামা বিদ্যাভবন। বিশাল আয়তন। প্রায় তেরশো ছাত্র। মন্দিরটির নামটি বড়ই সুন্দর—কল্পতরু শ্রীসীতারাম সেবা সদন।

শ্রী দয়াল সাহু এই আশ্রমের সেবক। ওরই উদ্যোগে কিঙ্কর বিঠ্‌ঠল রামানুজজী মহারাজের বিশেষ অনুপ্রেরণায় ওঙ্কারনাথ মিশন এবং রোটারী নারায়ণ মাল্টি স্পেশালিটি নেত্রালয়ের যৌথ উদ্যোগে একটি স্বাস্থ্য শিবির সংগঠিত করা হয়। শ্যামা বিদ্যাভবনের দোতলার অংশটি স্কুল কর্তৃপক্ষ ওঙ্কারনাথ মিশনকে ব্যবহার করতে দিয়ে বিশেষ কৃতজ্ঞতা ভাজন হন। প্রায় চারশ পঁয়তাল্লিশজন রুগী আসেন শিবিরে। দন্তবিভাগে ডাঃ অরবিন্দ সাহা আমাদের নৈহাটির বাসুদেব সাহার পুত্র, ঐ ভোরে নৈহাটি থেকে চলে আসেন গোবিন্দদাকে সঙ্গে করে। মেডিসিনে ছিলেন ডাঃ গৌতম বোস, (বারাসাত সরকারী হাসপাতালের ক্রিটিক্যাল ইউনিটের সঙ্গে যুক্ত)। সাঁইবোনা ওঙ্কারনাথ মিশনের সক্রিয় সদস্য দামুভাই উদ্যোগ নিয়ে ওকে নিয়ে আসেন। গ্রামের বহু বিশিষ্টজনেরা এগিয়ে এসে শিবির পরিচালনা করতে সাহায্য করেন। বিকেল সাড়ে চারটে পর্যন্ত শিবির চলে। সবচেয়ে অবাক কাণ্ড বেলা যত গড়ায় ততই রুগীর সংখ্যা বৃদ্ধি পেতে থাকে। ওঙ্কারনাথ মিশনের সর্বভারতীয় সম্পাদক কিঙ্কর দেবী প্রসাদের সক্রিয় উদ্যোগে এবং পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য ওঙ্কারনাথ মিশনের ওয়ার্কিং প্রেসিডেণ্ট শ্রী নয়ন রঞ্জন সাধু'র কর্ম তৎপরতায় টাকুয়া গ্রামের স্বাস্থ্য শিবিরটি সফল হতে পারল। সঙ্গে ছিলেন কিঙ্কর মৃণাল সাহা, নান্টু, শ্রী প্রদীপ রায়। প্রায় চল্লিশজন চক্ষু অপারেশনের জন্য বিবেচিত হন। শ্যামা বিদ্যাভবনের প্রধান শিক্ষক মহাশয় দয়াল সাহুর মাধ্যমে আবেদন করেছেন যাতে মিশনের উদ্যোগে শুধুমা ছাত্রদের নিয়ে একটি স্বাস্থ্য শিবির হয়।

মহারাজজীর এখন একান্ত ইচ্ছা ওঙ্কারনাথ মিশন বেশ কিছু জায়গায় স্থায়ী স্বাস্থ্য পরিষেবা কেন্দ্র খুলুক। প্রয়োজনে কেন্দ্রীয় তহবিল থেকে আঞ্চলিক শাখাগুলিকে কিছু অর্থ সাহায্য করা যেতে পারে। তারই প্রথম পদক্ষেপ—বৈদ্যপুর, রামনগর, কালনায় একটি স্থায়ী কেন্দ্র হতে চলেছে।

শ্যামা বিদ্যাভবনের পেছনেই একটা একতলা পাকাবাড়ী পাওয়া গেছে। যদিও জীর্ণ অবস্থা তথাপি এই ভবনটিকে সংস্কার করে নিয়ে আগামীদিনে মিশনের স্থায়ী কেন্দ্র হিসাবে চালু করার কথা ভাবার অনুরোধ করেন দয়ালদা। ঐ ঘরটি পবিত্র ঘর। ঐ ঘরে স্বামীজী, মহারাজ রাত্রি যাপন করে এসেছেন। মহারাজ সকলকে একই আহ্বান জানাচ্ছেন—লোক কল্যাণে ঝাঁপিয়ে পড়, লোক কল্যাণের মাধ্যমে শ্রীশ্রীঠাকুরের প্রচার প্রসারটা ভালভাবে করতে পারবে। সব চেয়ে বড় কথা বিপন্ন মানুষের পাশে দাঁড়ালে সেবা করলে তোমাদের অন্তরাত্মা তৃপ্ত হবে।

পরশ

অ নী শ দা স

তুমি পরশ দিয়াছ মোর পরাণে
তাই আমি খুঁজি সকল জীবনে
তোমার অমৃতনামে আবর্তিছে কিভাবে
এ বিশ্ব নিখিল প্রাণ।
নিভৃত প্রাণে আমি পেয়েছি তোমারে
তাই তো, আমার সকল চিত্ত অবসরে
স্মরিছে তোমার স্নিগ্ধ পুলক-
সুর-লয়-হীন তান।
আমি কিভাবে বর্ণিব আমার চেতনা
তাই আমি করি সুর-সাধনা
তোমার প্রাণেতে জীবন্ত করা
মম জীবনেরই গান।
প্রেম-সুরা রসে স্নাত করিলে
গ্রহ-তারা যত আছিল জগতে
তার সাথে তুমি আমার হিয়াকে
করালে মধুর স্নান।
তুমি কত দূরে কোথায় আছ?
কী তব রূপ, কী তব ছন্দ!
জানি নাই আমি—পাই আনন্দ
হয়ে সকল দ্বন্দ্ব অবসান।

অর্ঘ্য

অ পূ র্ব মু খো পা ধ্যা য়

নামযজ্ঞের মহাঋত্বিক
তুমি জন্মসিদ্ধযোগী
মহামায়ার এ মায়ার সংসারে
তুমি সংসারী, নহ ভোগী।
নামের প্লাবনে ভাসায়ে চরাচর,
তুমি শিখালে ভক্তজনে
সহজসাধন, হে অনন্তশ্রী-
প্রেমভক্তির পারাবার তব প্রাণে।
হরিনামসদা যার শ্বাসে প্রশ্বাসে
ব্রহ্মজ্যোতিঃ বিরাজিত হৃদয় আকাশে।
গুরুরে করালে তুমি ইষ্টদরশন,
গুরুপাদুকা লয়ে বক্ষে তীর্থ পর্যটন।
জীবন তরণীধায় ভবসিন্ধু বেয়ে
হায়, সদা বৈতরণী পানে,
বিক্ষুব্ধ তরঙ্গমালা বিপন্ন তরণী,
‘হাল ধরে সীতারাম’—মিনতি চরণে।

জয়গুরু

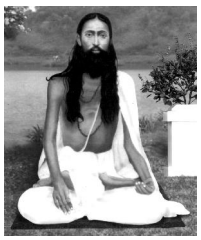

পরমগুরুদেব দাঁশরথিদেব যোগেশ্বরের আশীর্বাণী

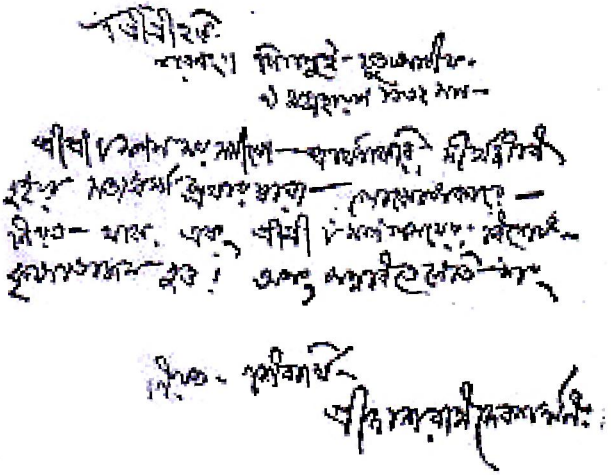

জয়গুরু

মাসিক মিলন পত্র

সকৃদেব প্রপন্নায় তবাস্মীতি চ যাচতে।
অভয়ং সর্ব্বভূতেভ্যো দদাম্যেতদ্ ব্রতং মম॥

অগ্রহায়ণ, ১৪২১ চতুর্থ সংখ্যা

সূচী ঃ

● **সঙ্গের ছিন্ন স্মৃতি** □ প্রসাদচন্দ্র মুখোপাধ্যায় ৩৪৮ ● **শ্রীগুরুদেবের চরণে সাতদিন** □ কিঙ্কর রামেন্দু দত্ত ৩৫২
● **শ্রীশ্রীঠাকুর সীতারাম** □ শ্রীমতী উষারাণী দেবী ৩৫৪

সঙ্গের ছিন্ন স্মৃতি

প্র সা দ চ ন্দ্র মু খো পা ধ্যা য়

অত্যল্প সময়ের মধ্যেও ভূপেশদার (শ্রীভূপেশচন্দ্র পাল) আয়োজন খুব ভাল হয়েছে। ভূপেশদার বহুদিনের আশা আজ বাবা পূর্ণ করে তাঁকে কৃতার্থ করলেন। ভূপেশদার উপর বাবার কৃপা অজস্র ধারায় বর্ধিত হয়েছে, হচ্ছে।

আজ রাত্রেই বাবা খিদিরপুরে শ্রীব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয়ের বাসভবনে যাবেন! রাত্রি ৮টার সময় বাবা আদেশ দিলেন সঙ্গী ছেলেরা আগে চলে যাক্ সীতারাম পরে যাচ্ছে। প্রণবদা সচ্চিৎদা রমানন্দদা প্রভৃতি আমরা বাবার নির্দেশে পূর্বেই এসে উপস্থিত হলাম। ব্রজেনবাবুর সাজান প্রভৃতি ঘুরে ঘুরে দেখলাম শ্রীযুক্ত পদ্মলোচনদার ভগ্নিপতি। বাড়ীর ছাদে দীক্ষার স্থান ও সামনের মাঠে বিরাট প্যাণ্ডেল করেছেন। অনেকদূর থেকেও বহুলোক দাঁড়িয়ে যেন শ্রীশ্রীঠাকুরকে দর্শন করতে পারেন সেজন্য একটি অতি সুন্দর মণ্ডপ বা প্ল্যাটফর্ম তৈরী করেছেন। মাত্র ১ দিনের মধ্যেই সর্বাঙ্গ সুন্দর করে সাজিয়েছেন।

রাত্রি অনুমান দুটোর সময় বাবা শুভপদার্পণ করলেন। তারপর উপস্থিত সকলের প্রণাম প্রসাদ করে দেবার জন্য কিঞ্চিৎ গ্রহণ করে প্রায় তিনটের সময় বিশ্রাম নেন।

২৭শে সোমবার ভোর ৫টায় উঠেছেন। শৌচান্তে তাঁর প্রাতঃকালীন পূজাদি করত এখনি আসছি বলে ব্রজেনবাবুর গাড়ীতে উঠে গেলেন। ফিরে এসে বললেন ঁকালীঘাটে ঁমার দর্শনে গেছলাম। এসেই প্রসাদ করে দিয়ে দর্শনার্থীদের কৃপা করবার জন্য সুদৃশ্য মঞ্চের উপর বসলেন।

দেড়শো দীক্ষার্থী বসান হয়েছে। প্রণামার্থীদের আশা মিটিয়ে বাবা দুটোর সময় দীক্ষাদান শুরু করলেন। চারটের সময় দীক্ষা শেষ করে তাদের জপ করতে উপদেশ নিয়ে অন্নপ্রসাদ নিয়ে ফিরে এসেই আবার দীক্ষার্থীর প্রণাম শুরু হল। সন্ধ্যা ৬টা পর্যন্ত দীক্ষার্থীদের প্রণাম শেষ করে নীচে এলেন। বাবার অসুস্থতা নিবন্ধন বাবাকে একটু বিশ্রাম নেবার প্রার্থনা জানাতেই বাবা সম্মতি দিলেন।

বেলা দুটো থেকে বাবা দীক্ষা দিতে এসেছেন তারপর প্রসাদ নিয়ে পুনরায় দীক্ষার্থীদের প্রণাম গ্রহণ করত সকলের প্রার্থনায় বিশ্রামে গেলেন সেজন্য বাইরের দর্শনার্থী ৬।৭ ঘণ্টা বাবার অদর্শন হেতু অত্যন্ত ব্যাকুল হয়ে পড়েন।

বাবার বিশ্রাম ঘরের সামনে থেকে নীচের বিরাট প্যাণ্ডেল মাঠ-রাস্তা পর্যন্ত 'ন স্থানং তিল ধারণে।' কর্মকিংকরগণ দর্শনার্থীদের নীচে যাবার জন্য অনুরোধ করেন—তা নাহলে এত ভীড়ে বাবাকে নিয়ে যাওয়া অসম্ভব। বহুকষ্টে রাত্রি প্রায় ৮টার সময় বাবাকে নীচেতে নিয়ে যাওয়া হল। এমন সময় বাবার চলার পথে কোন কোন লোক ভীড়ের মধ্যে হাত ঢুকিয়ে বাবার চরণ ধরে প্রণাম করেন। শ্রীচরণ টান পড়তেই বাবা পড়ে যান ও সঙ্গে সঙ্গে সেবকগণ ধরে নেন। জনতার এই উচ্ছৃঙ্খল আচরণ ভাল লাগলো না। বাবার আদেশে চলার সময় প্রণাম নিষিদ্ধ তৎ সত্ত্বেও বাবার অনেক ছেলেমেয়েদের দেখেছি, ভাবে গদগদ হয়ে কেহ কেহ জোরপূর্বক প্রণাম করতে যান। তাঁরা অবহিত হোন যে বাবাকে যদি মানেন তো বাবার আজ্ঞা মানতে হয়। বাবাকে মানি বাবার আজ্ঞা মানি না বললে বাবাকে মানা হয় না।

বাবা মঞ্চের উপর উঠলেন। অনুমান ১৪।১৫ হাজার নরনারী দীর্ঘ ৬।৭ ঘণ্টা প্রতীক্ষার পর দর্শন

লাভ করে স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেললেন। তারপর বাবার ভাষণ আরম্ভ হয়। প্যাণ্ডেলে বসার বা দাঁড়াবার স্থান সঙ্কুলন না হওয়ায় হাজার হাজার লোক এই শীতের মধ্যেও রাস্তার উপর মুক্ত আকাশ তলে দাঁড়িয়ে বাবার শ্রীমুখ নিঃসৃত বাণী শুনতে লাগলেন। দুই আড়াই ঘণ্টা ধরে ভাষণ দিতে দিতে বাবা সমাধিস্থ হলেন। নাম শুনতে শুনতে বাবার সমাধি ভঙ্গ হলে পর প্রণাম পর্ব শুরু হল। প্রণাম গ্রহণ করে বাবা উপরে এসে ফল প্রসাদ নিলেন। বাবা ত্যাগী ছেলেদের আদেশ দিলেন তোরা আজ এখানে থেকে কাল বামুনপাড়া যাবি সেখান থেকে সঙ্গে নিয়ে নেব। বাবার আদেশে গঙ্গাদা-সেবাদা ও আমি শ্রীচরণ সঙ্গী হলাম।

খিদিরপুর থেকে রাত্রি ১২-১৫ মিঃ বাবার রথ ছুটল। পথে একজন খঞ্জদর্শনার্থিকে দর্শনদান করে ভবানীপুরে ক্যান্সার হাসপাতালে উঠলেন। হাসপাতালের ডেপুটি সুপারিন্টেনডেন্ট বাবার শ্রীচরণাশ্রিত। তিনি নীচেতে বাবার জন্য অপেক্ষা করছিলেন। বাবাও আমাদের লিফ্টে নিয়ে ৪ তলায় উঠলেন। বাবা ঘরে ঢুকতেই অসুস্থ পণ্ডিত মহাশয় যুক্ত করে উঠে দাঁড়ালেন। বাবা সাষ্টাঙ্গ প্রণাম করলেন। তারপর উভয়ের প্রেমপূর্ণ গাঢ় আলিঙ্গন। কয়েক মিনিট কেটে গেল এইভাবে। কোলাকুলির পর আবার বাবা প্রণাম করলেন। উভয়ের মিলন এক অপূর্ব দৃশ্য—যেন হরিহর মিলন। উভয়েই বসলেন, বাবা বললেন কই ভস্ম দে। বাবা ভস্ম নিয়ে পূজ্যপাদ পণ্ডিত মহোদয়ের গলায় মাখাতে লাগলেন। শশাঙ্কদা ও তাঁর স্ত্রী বাবাকে জানালেন উনি (মহামহোপাধ্যায়কে দেখিয়ে) ওষুধ খেতে চাচ্ছেন না। বাবা বললেন সীতারাম রোজ এখনও কত ওষুধ খাচ্ছে। পূজ্যপাদজীর দৃঢ় বিশ্বাস যে সীতারামের এই ভস্মলেপনেই তিনি ভাল হবেন। হাজার প্রকার ওষুধে কোন ফল হবে না।

বাবা বিয়ের প্রসঙ্গ তুললেন। চুপিচুপি হবে দু'মণ ময়দার কথা বলে এসেছি। কাল বিয়ে দেবার জন্য সীতারাম বৈঁচীতে যাবে। পাত্রপাত্রীর কথাও বললেন। পাত্রীকে আপনি সীতারামের কাছে দেখেছেন কাজকর্মে যথেষ্ট নিপুণা খুব শান্ত প্রকৃতি। ওরকম আর খুব দেখা যায় না। বিয়ের দু'দিন সময় আছে বলে কলকাতায় বেড়াতে এসেছি হাসতে হাসতে বললেন 'পাওনা গণ্ডাই বা ছাড়ি কেন যা আসে তাই লাভ।'

বাবা দর্শনার্থীদের দর্শন দান ও প্রণাম নেওয়াকে পাওনা গণ্ডা বলেন।

রাত্রি প্রায় ১টার পর বাবা মহামহোপাধ্যায়কে প্রণাম করত বিদায় নেন। ২টার সময় বালীতে বাবার 'নিভৃতকুঞ্জে' এসে উপস্থিত হলেন। পাত্রপাত্রীর অলঙ্কার বস্ত্রাদি দেখে, প্রসাদ করার অছিলায় খই দুধ নিয়ে বিশ্রাম নিলেন রাত্রি ৩টার সময়।

২৮শে মঙ্গলবার, মঙ্গলারতি করবার জন্য ভোর ৫টায় উঠে দেখি বাবা অনেক পূর্বেই উঠেছেন। এত সকালেও প্রায় দু'শো দর্শনার্থী। তাদের সকলের প্রণাম নিয়ে বাবা যখন গাড়ীতে উঠলেন তখন ৮টা।

সেবাদা মাইকযোগে নাম করতে করতে যাচ্ছেন। নাম শুনেই পাছে সকলে বাবার গাড়ীকে আক্রমণ করবেন ও বিয়ে বাড়ীতে পৌঁছতে বহু বিলম্ব হবে এই আশঙ্কায় বাবা ভদ্রকালীতে নেমে পিছনের ডাঃ পঞ্চাননবাবুর গাড়ীতে উঠে বললেন সেবা গঙ্গারাম তোরা নামের গাড়ী নিয়ে পরে আয়, সীতারাম আগে বেরিয়ে যাক। ড্রাইভারকে বললেন জোরে চল। বৈদ্যবাটী রেলগেটে গাড়ী আটক হওয়ায় পিছনের নামের গাড়ী এসে উপস্থিত হওয়া মাত্রই শ্রীশ্রীঠাকুর জেনে সকলে গাড়ীকে ঘিরে ফেললেন। নামের গাড়ীতে বাবাকে দেখতে না পেয়ে আগের গাড়ীতে খুঁজে বার করে ফেললেন। সকলে দরজা খুলে প্রণাম করতে চায়। দরজা খোলা হল না। বাবা হাত বাড়িয়ে সকলের মাথায় হাত দিয়ে আশীর্বাদ করলেন।

গেট খুলতেই ড্রাইভার জোরপূর্বক সকলের বাবাকে কেড়ে নিয়ে তীব্র গতিতে গাড়ী চালাতে লাগলেন। ভদ্রেশ্বর থেকে চুঁচুড়া পর্যন্ত আবার গাড়ী হয়তো অনেকে আটক করবে তাই বাবা গাড়ীর ভিতর ঢাকা দিয়ে শুয়ে পড়লেন। ঐ সমস্ত স্থান খুব জোর পার হয়ে এসে হুগলির সন্নিকটে গাড়ীর ইঞ্জিন খুব গরম

হয়ে স্টার্ট বন্ধ হয়ে গেল। জলের সন্ধান করেও পাওয়া গেল না। ড্রাইভার ইঞ্জিনের ঢাকনা খুলে দাঁড়িয়ে রইলেন। কিছু বাদেই নামের গাড়ী এসে উপস্থিত। বালির মামা (জগৎপতি চট্টোপাধ্যায়) সে গাড়ী থেকে নেমে এসে রাস্তার পাশে বর্ণবাহ্য জাতির বাড়ী থেকে জল নিয়ে জল ঢাললেন। বাবা ঢাকার ভেতর হতে বললেন গাড়ী কি হাঁ করে আছে? জল খাব খাব করছে নাকি? হ্যাঁ বাবা—উত্তর দিলাম।

বাবা সর্বাঙ্গে চাদরমুড়ি দিয়ে লুকিয়ে যাচ্ছেন যাতে কেহ কোন প্রকারে চিন্তে না পারেন তাই জটা পর্যন্ত ঢেকে দিয়েছেন। আমরা বললাম বাবা আপনার গরম করছে না। এখানে লোকজন নেই ঢাকা খুলুন। বাবা সীতারাম হাঁপিয়ে যাচ্ছে। তোরা দেখ ভাল করে কেউ আসছে কিনা এই বলে যেমন ঢাকা খুলে উঠে বসেছেন সঙ্গে সঙ্গে নামের গাড়ীর কাছ থেকে ৪।৫টি ছোট ছেলেমেয়ে বাবার গাড়ীর কাছে এসে গেল, তাদের দেখেই বাবা বললেন না আর দরকার নাই একেবারে মগরা পার হয়ে উঠে বসব, বিশ্বাস নেই বাবা কোথায় কখন কে ঝপাৎ করে আক্রমণ করে ফেলবে।

বাবার এভাবে লুকিয়ে যাবার কারণ যে প্রথমত গাড়ী ক'বার রেলগেটে আটক ও স্টার্ট বন্ধ হওয়ায় অনেক বিলম্ব হয়েছে। দ্বিতীয় বিয়ে বাড়ীতে পৌঁছতে দেরী হলে পাত্রপাত্রী উভয় পক্ষেরই নানা কাজের গোলমাল হবে ও ভীড়ের জন্য বহু অসুবিধায় পড়তে হবে। পাত্র বাবার একান্ত শরণাগত। বাবা সে পক্ষের ভার দিয়েছেন তাঁরই চরণাশ্রিত পঞ্চানন দাঁর উপর। আর পাত্রীপক্ষের ভার দিয়েছেন পরমারাধ্য পরমগুরুদেবের কনিষ্ঠ জামাতা শ্রীযুক্ত গোপীমোহন বন্দ্যোপাধ্যায় ও তাঁর অগ্রজকে। সকলেই বাবার শরণাগত শিষ্য।

প্রায় আধঘণ্টা বাদে গাড়ী ছাড়ল বাবা গঙ্গাদাকে বলে দিলেন তোরা নামের গাড়ী নিয়ে পরে আয় সীতারাম আগে মগরা পার হয়ে যাক। আমাদের বললেন দেখিস তোদের দেখলেও মগরার সব চিনে ফেলে গাড়ী আক্রমণ করবে তোরা মুখে ঢাকা দে তিলক যেন দেখতে পায় না। মগরা পার হতেই বাবা উঠে বসলেন আমাকে বললেন দেখো বাবা এসব যেন 'জয়গুরুতে' দিও না। আমি বললাম তা কি হয়, কিছু কিছু দেবো।

বাবার এই ভাবের রসক্রীড়া বা লুকোচুরি খেলা দেখে খুব আনন্দ হতে লাগল। তিনিও রসময়, আনন্দময়, তাঁর প্রতিটি কর্মই রসে আনন্দে ভরা। বাবা ১২টার সময় বৈঁচীতে পৌঁছিলেন। বিয়ের ব্যবস্থাদি দেখে ফলপ্রসাদ নিয়ে চলে গেলেন দর্শন দিতে ও প্রণাম নিতে। সারা গ্রাম ব্যেপে আজ আনন্দের হাট বসেছে। কোথাও কোথাও নাম হচ্ছে কোথাও দীক্ষার্থীরা বসেছে। কোথাও বা দর্শন প্রণামের স্থান হয়েছে, একস্থানে বাবার ভোগ রান্না হচ্ছে, আবার স্বতন্ত্র স্থানে নরনারায়ণের জন্য রান্না চলছে, কোথাও বা নান্দীমুখাদি শুভকর্ম অনুষ্ঠিত হচ্ছে। সব কাজগুলি যেন মেসিনে হয়ে যাচ্ছে। বাবার যা নিত্যকর্ম তিনবেলা পূজাদি, দর্শনদান, দীক্ষাদান প্রভৃতি কর্মগুলি যথাসময়ে তিনি করলেন। দিগসুই ঠাকুরবাড়ী হতে পূজনীয়া বড়দি ও পূজনীয় দাদা (শ্রীযুক্ত শ্যামাশঙ্কর বিদ্যাভূষণ) এসেছেন।

রাত্রি ৮টায় বিবাহ কার্য্য আরম্ভ হল। পূজনীয়া লক্ষ্মীমা কন্যা সম্প্রদান করলেন। বিবাহ সমাপ্তি পর্যন্ত বাবা বসেছিলেন। রাত্রি ২টা ৩টা পর্যন্ত খাওয়া দাওয়া হয়।

২৯শে বুধবার অনুমান ৫টায় বাবা উঠেছেন। আদেশ দিলেন তুই আরতি সেরে সব গুছিয়ে নে। আদেশমত করে তৈরী হলাম। আজই বাবা বর্ধমান হয়ে বহরমপুর যাবেন। বর্ধমান থেকে ডাঃ শৈলেনদা গাড়ী পাঠিয়েছেন বাবাকে নিয়ে যেতে। বাবা গঙ্গাদাকে বললেন তোরা মালপত্র নিয়ে বামুনপাড়া হয়ে আয় সীতারাম এখনি ট্রেনে চলে যাবে।

পরমগুরু কন্যা পূজনীয়া রাসমণি দিদি এবং পূজনীয় গোপীদা বাবাকে ট্রেনে তুলে দিতে এলেন। বৈঁচীগ্রাম স্টেশনে ৮-১৭ মিনিটে গাড়ীতে চেপে ৯-১৭ মিনিটে বর্ধমানে নামলেন। বর্ধমান বাবার পুরানো স্থান।

হঠাৎ নামলেও স্টেশনে শতাধিক লোক বাবাকে ঘিরে ফেললেন, স্টেশন থেকে শৈলেনবাবুর বাড়ীতে শুভাগমন করলেন। বাবার শুভাগমন সংবাদ মুহূর্তে প্রচার হয়ে গেল দলে দলে নরনারী এসে উপস্থিত হলেন। বাবা দোতলার উপরে উঠে দেখেন নবদ্বীপের পরমবৈষ্ণব শ্রীমৎ জিতেন্দ্রনাথ গোস্বামী মহোদয় এবং বাবার পূর্বপরিচিত কবিরাজ বেদান্ততীর্থ মহাশয় বসে আছেন। কবিরাজ মহাশয়ও ভক্ত এবং বৈষ্ণব সাধক। উভয়েই বাবার দর্শনলাভে অত্যন্ত আনন্দ প্রকাশ করলেন। বাবার সঙ্গে বৈষ্ণবদ্বয়ের প্রায় এক দেড়ঘণ্টা ধরে আলাপ আলোচনা হয়। শ্রীনাম তত্ত্ব ও শরণাগত এবং জপাদির মহিমা প্রভৃতি আলোচিত হয়। গোস্বামী বললেন—শুধু নাম কীর্তনে কিছু হয় না, শরণাগত হয়ে ভক্তিভরে নাম করলে তবে কাজ হয়। সকলের মূল ভক্তি। আজকাল প্রায়ই সকলে আচারহীন, ভক্তিহীন। হঠাৎ তারা যদি নাম করে তাদের তাতে কোন ফলই হয় না। নামকীর্তন করতে গেলে চাই শ্রদ্ধা, ভক্তি, বিশ্বাস। যদি শ্রীভগবানের নামে বিশ্বাস না থাকে তাহলে নাম করে ফল কি? পূজ্যপাদ গোস্বামীজীর প্রতিটি কথা বাবা শুনছেন। কবিরাজ মহাশয় তাঁর কথাতেই আস্থা রেখে মেনে নিলেন। তিনিও কয়েকটি ভক্তির শ্লোক আবৃত্তি করলেন। মনে হল বাবা যেন তাঁর কথায় সম্মতি দিতে পারলেন না। বাবা উভয়কেই বললেন কেন আপনাদের শাস্ত্রে কি নেই?

শ্রদ্ধয়া হেলয়া নামঃ রটন্তি মম জন্তবঃ।
তেষাং নাম সদাপার্থ বর্ত্ততে হৃদয়ে মম।।

শ্রীভগবান অর্জুনকে বলেছেন হে পার্থ! শ্রদ্ধা করে হোক হেলা করে যারা আমার নাম করে তাদের নাম আমার হৃদয়ে গ্রথিত অর্থাৎ আঁকা থাকে।

তখন গোস্বামীপাদ বললেন এখানে 'হেলয়া' মানে 'অনাবেশে'। সে হরিনাম করছে না অনাবেশে তার জিহ্বা হরিনাম উচ্চারণ করেছে। বাবা আবার বললেন শ্রীমদ্ভাগবতে আছে-

সঙ্কেত্যৎ পারিহাস্যংবা স্তোভং হেলনমেব বা।
বৈকুণ্ঠনাম গ্রহণমশেষাঘহরং বিদুঃ।।

এখানে এই 'হেলা' শব্দের সঙ্গে 'এব' যোগে হেলা করার আরও গুরুত্ব আরোপ করা হইয়াছে। অর্থাৎ হেলা করেও নাম করলে অশেষ পাপ ধ্বংস হয়। এখানে ভাগবতোক্ত শ্লোকটির ব্যাখ্যা দেখা যাক্। সাঙ্কেতৎ-স্ত্রীপুত্রাদৌ সঙ্কেতিতম্ স্ত্রীপুত্রাদির নাম গ্রহণে যদি শ্রীভগবানের নাম হয় যেমন স্ত্রীর নাম দুর্গাদাসী বা পুত্রের নাম রামদাস এইভাবে সঙ্কেতে ও ''পারিহাস্যং'' অর্থাৎ ''পরিহাসেন কৃতং'' পরিহাস করে নাম করলেও স্তোভং ''গীতালাপপূরণার্থং'' সঙ্গীত আলাপে যেমন গুরুহে প্রভুহে কৃষ্ণহে এই প্রকার, হেলনং সাবজ্ঞং অবজ্ঞার সহিত ''এব বা'' ইহার বিশেষত্ব এই যে খুবই অবজ্ঞার সহিত ''বৈকুণ্ঠনামগ্রহণং'' যদি শ্রীভগবানের নাম করা হয় তা হলেও ''অশেষাঘ হরণ'' নিখিল পাপনাশকং ভবতীত্যর্থঃ।। আবার বাবা গোস্বামীজীকে বললেন— আপনাদের ভক্তি শাস্ত্রে কি নাই?

মধুর মধুর মেতন্মঙ্গলং মঙ্গলানাম্
সকল নিগমবল্লী সৎফলং চিৎস্বরূপম্
সকৃদপি পরিগীতং হেলয়া শ্রদ্ধয়া বা
ভৃগুবর নরমাত্রং তারয়েৎ কৃষ্ণনাম।।

মধুর হতে মধুর মঙ্গলেরও মঙ্গল সমস্ত বেদলতার চৈতন্যময় প্রাণস্বরূপ হেলায় অথবা শ্রদ্ধায় এই কৃষ্ণনাম যদি একবারও সর্বতোভাবে গীত হয় তাহলে হে ভৃগুবর এই কৃষ্ণ নরমাত্রকে ত্রাণ করেন। বাবার কথা শুনে উভয়েই বললেন হাঁ আপনি ঠিক বলেছেন।

বাবা আবার বললেন—

'সকৃদুচ্চারিতং যেন হরিরিত্যক্ষর দ্বয়ং।
বদ্ধঃ পরিকরস্তেন মোক্ষায়গমনং প্রতি।।

শাস্ত্র আরও বলেছেন—

সকৃদুচ্চারয়েৎ যস্তু নারায়ণতন্দ্রিতঃ।
শুদ্ধান্তঃ করণো ভূত্বা নির্ব্বাণমধিগচ্ছতি।।

ক্রমশঃ

শ্রীগুরুদেবের চরণে সাতদিন

কিঙ্কর রামেন্দু দত্ত

(২)

সোমবারও জনসমাগম ও ভিড় চলল আগের দিনের মত। সোমবার শ্রীশ্রীঠাকুর সকালে, অপরাহ্নে ও সন্ধ্যার পর তিনবার দর্শন দিলেন। বাংলার ছেলেমেয়েরা বাবার কাছে আবেদন জানালেন এবার চাতুর্মাস্য বাংলায় করতে হবে।

শ্রীশ্রীঠাকুর প্রথমে ইঙ্গিতে পরে লিখে জানালেন —আদেশ না আসা পর্যন্ত তিনি কিছুই জানেন না। মৌন কবে সমাপ্ত হবে, তা তিনি বলতে পারেন না। ঐদিন বিভিন্ন আশ্রম ও পত্রিকাগুলির পরিচালনা ব্যাপারে অনেক সময় কেটে যায়। কলকাতা থেকে শ্রীতড়িৎ কুমার দে ও শ্রীভূপেশ চন্দ্র পাল গিয়েছিলেন। তাঁরা শ্রীশ্রীঠাকুরের শ্রীচরণে কলকাতায় আশ্রম প্রতিষ্ঠার অনুমতির জন্য নিবেদন জানালেন। শ্রীঠাকুর লিখে জানালেন—কলকাতায় আশ্রমের সম্পর্কে প্রথমে উদ্যোগী হয়েছিল মহেন্দ্র (শ্রীমহেন্দ্রনাথ করঞ্জাই, বেলেঘাটার দাদা), তার সঙ্গে পরামর্শ কর। তারপর লিখলেন, ''মহেন্দ্র, শ্রীকুমার, পঞ্চানন, উমেশ, রাসগোপাল, জিতেন, বিরল, কাপুর প্রভৃতিকে নিয়ে এ বিষয়ে পরামর্শ করে করবি। তবে ভিক্ষা চাওয়া সীতারামের আদর্শ বিরোধী এটা যেন তারা মনে রাখে।'' দাদারা কথা দিলেন যে কোনরকম ভিক্ষা বা প্রার্থনা জানান হবে না। স্থান নির্বাচনের প্রসঙ্গে বাবা লিখলেন—''গঙ্গা তীরেই কর।''

কলকাতায় জয়গুরু সম্প্রদায়ের একটি স্থায়ী আশ্রম হবার বিশেষ প্রয়োজন রয়েছে, এ অভাব দীর্ঘদিন ধরে আমাদের পীড়িত করছে। শ্রীশ্রীঠাকুরের এবার যখন ইচ্ছা হয়েছে, আশা করা যায় অদূর ভবিষ্যতে এ অভাব দূর হবে। সম্প্রদায়ের পত্রিকাগুলি ও শ্রীশ্রীঠাকুর লিখিত গ্রন্থগুলি প্রকাশের ব্যবস্থার জন্য সম্প্রদায়ের একটি নিজস্ব ছাপাখানা হোক—এ অভিমতও শ্রীশ্রীঠাকুর অনুমোদন করলেন। স্থির হয়েছে—কলকাতা আশ্রমেই ছাপাখানা, কাগজগুলির (বিশেষ করে মাদার পত্রিকার নামই বাবা করেছেন) কর্মকেন্দ্র প্রভৃতি একসঙ্গে থাকবে।

মঙ্গলবার থেকেই কেউ কেউ বিদায় নিতে শুরু করলেন। সেদিনও শ্রীশ্রীঠাকুরকে কেন্দ্র করে আনন্দের স্রোত তেমনই বয়ে গেল। শ্রীশ্রীঠাকুর মঙ্গলবার রাত্রে জানালেন যে, পরদিন বুধবার থেকে তাঁর মৌন আবার আগের মত কঠোর হবে। উপস্থিত সকলেই এতে একটু মুষড়ে পড়লেন—এমন সঙ্গসুখ আরও কয়েকদিন উপভোগ করার আশা ছিল।

বাবা জানালেন যে তাঁর মৌন অনির্দিষ্ট কালের জন্য চল্‌বে এবং মৌনান্তে এক অভিনব ধরনের প্রচার বাসনা তাঁর মনে মাঝে মাঝে ভাসছে। তবে সে সম্পর্কে তিনি এখনও কিছুই স্থির করেন নি। কৃপাময় তাঁর সন্তানদের মনের অবস্থা বুঝতে পারলেন। সেজন্য অনুমতি দিলেন—দৈনিক একবার, সকালে শ্রীতুলসী পরিক্রমার সময় তাঁর ভক্তদের ও সন্তানদের তিনি দর্শন দেবেন। আমরা কুটাইদিদিকে দিয়ে আর একটি প্রার্থনা জানালাম---বৃহস্পতিবার স্নানযাত্রার দিন, বাবার স্নানকালে আর একবার দর্শন করবার সৌভাগ্য যেন আমাদের হয়। আমাদের সে প্রার্থনাও ঠাকুর পূর্ণ করেছেন।

দেখতে দেখতে সাতদিন কেটে গেল। কেমন করে যে আনন্দস্রোতে সাতটি দিন চলে গেল তা যেন টেরও পেলুম না। অথচ অনভ্যস্ত জীবনযাত্রা প্রণালী, আর সেই সঙ্গে উত্তর প্রদেশের প্রচণ্ড গরম। কিন্তু এ কথা ঠিক এই সাতটি দিনের স্মৃতি চিরদিন আমার বুকে অক্ষয় হয়ে থাকবে। শুধু আমার নয়, আমার বিশ্বাস যাঁরা যাঁরা এই পূণ্যতীর্থে গিয়ে ধন্য হয়েছিলেন, প্রত্যেকেই আমার সঙ্গে

একমত হবেন। বারে বারে মনে পড়েছে ওঙ্কারেশ্বরের এমনই আনন্দময় দিনগুলির কথা।

যাবার দিন এল। শুক্রবার সকাল থেকেই মনটা যেন বেসুরো হয়েছিল। শ্রীশ্রীঠাকুরের শ্রীতুলসী পরিক্রমা সমাপ্ত হল। মৌন কুটীরের ছায়ায় বাবা কম্বলের আসন পেতে বসলেন। আমরা তাঁকে ঘিরে বসলুম। অন্তর্যামী আমাদের অন্তরের কথা জানতে পেরেছেন—তাই অনেকক্ষণ সঙ্গদান করলেন। সেদিন ভোগও নিলেন অন্যদিনের থেকে আগে। আমরা প্রসাদ পেয়ে সবে উঠছি এমন সময় সেবাদা খবর দিলেন—আজ যাঁরা যাবেন বাবার কাছে যান, বাবা ডাকছেন। শুরু হল অপূর্ব স্নেহসিঞ্চন। এত স্নেহ, ভালবাসা, কৃপা—আমরা কি সত্যই এ সবের যোগ্য? বারে বারে এ প্রশ্ন জেগেছে। বাবা প্রত্যেককে কিছু না কিছু লিখলেন—প্রত্যেকের অন্তর সুধায় ভরে দিলেন। তারপর তাঁর একটি রচনা পড়তে দিলেন। এটির প্রথম অংশ পড়া হয়েছিল সোমবার রাত্রে, আজ পড়া হল দ্বিতীয় অংশটুকু --- মহাভারতামৃত—মহাভারতের 'স্থান বিশেষ' থেকে উদ্ধৃতি নিয়ে তার অনুবাদ ও আলোচনা। কারুর নিন্দা করবে না। কারুর নিন্দা শুনবে না সকলের মধ্যে যে গুণগরিমা আছে, তাকে শ্রদ্ধা করতে হবে। এইভাবে আলোচনা চলল। যেসব বিরক্ত দাদা আমাদের সঙ্গে ফিরছিলেন তাঁদের লক্ষ্য করে শ্রীশ্রীঠাকুর একটি বিস্তৃত উপদেশ লিখে দিলেন। সাধন পথের কঠোর ব্রত কেমন করে পালন করতে হবে। প্রত্যেকের খাওয়া হয়েছে কিনা, বিরক্ত ভায়েদের যাবার পাথেয় আছে কিনা, ইত্যাদি খুঁটিনাটি প্রতিটি প্রশ্নের মধ্যে দিয়েই তাঁর স্নেহপ্রবণ পিতৃহৃদয়টির পরিচয় আমরা প্রতিমুহূর্তেই পাচ্ছিলাম।

তিনটে বেজে দশ মিনিটে গাড়ী ছাড়বে। যখন তিনটে বাজল তখনও আমরা বাবার মৌনকুটীরে বসে আছি। সত্যদা স্মরণ করিয়ে দিলেন গাড়ী ছাড়ার সময়টি। অনিচ্ছাসত্ত্বেও উঠতে হল। ঠাকুরও যেন সেইভাবেই আমাদের বিদায় দিলেন। লিখে জানালেন—এরপর তিনি আর কোন চিঠি বা সংবাদ নেবেন না বা দেবেন না। মৌন কঠোরতর হতে চলেছে—এ তার পূর্বাভাষ।

সকলে সাষ্টাঙ্গে প্রণাম করে ধীরে ধীরে ঘর ছেড়ে বেরিয়ে এলুম। সেই পুণ্যপীঠের রজঃ কপালে-মাথায় মেখে ''জয় শ্রীগুরু মহারাজ জীউ কি জয়'' বলে অদূরে স্টেশনের পথে পা বাড়ালুম। আশ্রমের দাদারা স্টেশন পর্যন্ত এলেন। সচ্চিদানন্দ দা বড় এক ঠোঙা বাতাসা ভোগ নিয়ে এসেছেন। সকলের হাতে হাতে দিয়ে বললেন—রাত্রে যদি পিপাসা পায়, এই প্রসাদটুকু দিয়ে জল খেও। দাদার আন্তরিকতার তুলনা হয় না।

ট্রেন ছাড়ার ঘণ্টা পড়ল। কিন্তু গাড়ী ছাড়ে না। আমরা সতৃষ্ণ নয়নে তাকিয়ে আছি অদূরে আম্রকুঞ্জের মধ্যে আশ্রমের দিকে। বাবার মৌনকুটীরের ছাউনীর একটুখানি দেখা যাচ্ছে। গাড়ী ছাড়ল। সচ্চিদানন্দদা, সেবাদা, সত্যদা গাড়ী থেকে নেমে গিয়ে হাত নাড়াতে লাগলেন—কিন্তু তাঁদেরও যেন চোখ ছল্ ছল্ করছিল।

ধীরে ধীরে ছায়াছবির মত মিলিয়ে গেল আম্রকুঞ্জের মধ্যে বাবার আশ্রমটি—তখনকার মনের অবস্থা ভাষায় বলতে পারব না।

জয়গুরু

বোলপুর ও শান্তিনিকেতন

শ্রীশ্রীঠাকুর সীতারামদাস

শ্রীমতী ঊষারাণী দেবী

(২)

তাড়াতাড়ি গঙ্গাজলের ঘটি বের করে জল ভরলাম! মুহূর্ত্ত বিরাম নেই সারাদিন সেই ভোর থেকে বাবার পিছনে পিছনে ঘুরছি। তবুও এতটুকু ক্লান্তি নেই। কি আকুল আগ্রহ। বিশ্বাস হচ্ছে না বাবা আসবেন আসতে পারেন আমাদের বাসায়। বল্‌লাম—খোকা তোমার বাবার সঙ্গে রিক্সা করে এখুনি চলে যাও সুবর্ণদি'র বাড়ী নইলে তোমার আর দর্শন হবে না তাঁর চরণ-ধূলো পাবে না। এত কাছে এসেও এতদূরে থাকবেন বাবা। রিক্স নিয়ে খোকা চলে গেল। খোকা সেখানে পৌঁছবার সঙ্গে সঙ্গেই বাবা বীণাদির বাড়ী ঘুরে সুবর্ণদির বাসায় পৌঁছলেন। সেখানে সকলের সঙ্গে আমার বোন ও খোকার প্রণাম নিলেন। ছবি বললে বাবাকে, এতদূর এসেছেন, একবার আমাদের বাড়ীতে পায়ের ধূলো দেবেন না? বাবা বললেন—বড্ড ক্লান্ত, কত দূরে যেতে হবে—

ছবি বললে বেশী দূরে নয় কাছেই।

চল যাব। কিন্তু আর কেউ'ত আমাকে আবার তাদের বাড়ী নিয়ে যেতে চাইবে না—যদি কথা দিস আর কারও বাড়ী যেতে হবে না তবে চল্‌।

দেখি খোকা একাই ফিরছে। ফিরে বললে—বাবা আসছেন তাড়াতাড়ি সব জোগাড় কর।

পা ধোবার জল রাখ। আসন পাত। মাসীমণি বললে বাবা এখুনি আসবেন। খোকার আনন্দ আর ধরে না। দেখি ছবিও দৌড়তে দৌড়তে এসে পৌঁছল। তার পেছনে পেছনে এসে আমাদের বাড়ীর সামনের বড় রাস্তায় দাঁড়াল বাবার মোটর। সঙ্গে নাম কীর্তনের দল। মোটর থেকে নেমে বাবা একটু হেঁটেই আমাদের বাড়ীতে এলেন। সঙ্গে আছেন ত্যাগী দাদারা, গুরুভাইয়েরা ও লক্ষ্মীদিদি। আমাদের অরুণাদিও (বর্ধমানের ডাঃ শৈলেন মুখার্জী মহাশয়ের পত্নী) এসেছিলেন আমাদের বাসায়।

কয়েক মিনিট ছিলেন। কি করবো ভেবে পাচ্ছিলাম না। আসন পাতা চেয়ারে বসলেন। আমরা প্রণাম করলাম তাঁর পায়ে। মন প্রাণ শুদ্ধ হয়ে গেল। মুহূর্তের জন্য যেন সব কথাও ফুরিয়ে গেছে। কি যে বলবো। আমাদের সকলের প্রণাম নিলেন—আশীর্বাদ দিলেন। যাবার সময় বাবার গলায় পরিয়ে দিলাম একগাছি আধ-ফোটা আকন্দ ফুলের কুড়ির মালা। মালা গলায় বাবাকে কি সুন্দর না দেখাচ্ছিল।

ভাবতে পারিনি আমরা কোন দিন-ই যে বাবা আমাদের বাড়ীতে আসবেন, বসবেন, প্রণাম নেবেন। আমাদের মত অভাগাকে তাঁর আশীর্বাদ দেবেন। কত দিনের একান্ত ইচ্ছা আজ আমাদের পূর্ণ হল। দিনরাত যে তাঁকে ডাকি, তাঁর দেওয়া মহামন্ত্র জপ করি কাজকর্মের ফাঁকে ফাঁকে যখনই মনটা বলে ওঠে তাঁর দেওয়া তারক-ব্রহ্ম নাম করি। সে কি আনন্দ পেয়েছি বাবা এলেন আমাদের বাসায়। বলে বোঝাতে পারব না। আর ত কিছু চাই না। তিনি এসেছেন আমাদের সুখ-দুঃখের আবাসস্থলে আমাদের সংসারের কোলে, আশা-নিরাশার একেবারে মাঝখানে এসে বসেছেন। আমরা ত তাকে যথাযোগ্য আবাহন করতে পারিনি। কোথায় পাব তিনি যা দিয়েছেন তাই দিয়েই তাঁর পূজা ভোগ সাজিয়েছি। চোখের জলই যে আমাদের একমাত্র সম্বল।

কিছুক্ষণ ছিলেন কিন্তু যতটুকু সময় ছিলেন সে যেন সপ্ন। এখনও যখনই ভাবি সেইদিনের কথা মনপ্রাণ আনন্দে ভরে ওঠে। ভাবি কি করে সম্ভব হল। সদাসর্বদা বাবাকে মনে মনে ডেকে বলি আশীর্বাদ কর তোমার দেওয়া মহামন্ত্র যেন আমাদের জীবনে জাগ্রত হয়ে ওঠে; তোমার দেওয়া তারকব্রহ্ম নাম যেন অহোরাত্র আমাদের ঘিরে থাকে। দুঃখ দারিদ্র্য নিরাশার আঘাতে জর্জরিত জীবনে শান্তি পাই, সত্যকে পাই। মঙ্গল, কল্যাণ কে পাই, পরমানন্দময় পরম কল্যাণময় পরমানন্দময়ের দিকে যেন মনের গতি হয়। জীবনে সমস্ত চিন্তাকে কর্মকে, অনুভূতিকে যেন পরমব্রহ্মের দিকে তুলে ধরতে পারি।

রুদ্র যৎ তে দক্ষিণং মুখম্‌
তেন মাং পাহি নিত্যম্‌।